নিবোধত

৩৭ বর্ষ * ১ম সংখ্যা
মে-জুন ২০২৩





মনটি দুধের মত। সেই মনকে যদি সংসার-জলে রাখ, তা হলে দুধে-জলে মিশে যাবে। তাই দুধকে নির্জনে দই পেতে মাখন তুলতে হয়। যখন নির্জনে সাধন করে, মনরূপ দুধ থেকে জ্ঞান ভক্তি রূপ মাখন তোলা হলো তখন সেই মাখন অনায়াসে সংসার-জলে রাখা যায়। সে মাখন কখনও সংসার-জলের সঙ্গে মিশে যাবে না—সংসার-জলের উপর নির্লিপ্ত হয়ে ভাসবে।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার সংস্থা

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১

৩৭ তম বর্ষ ● ১ম সংখ্যা

নিবোধত

মে-জুন ২০২৩

'যদ্ ভদ্রং তন্ন আ সুব'—যা কিছু কল্যাণকর ও শুভ তা-ই আমাদের নিকট উপস্থিত হোক।
(শুক্লযজুর্বেদসংহিতা, অধ্যায় ৩০, মন্ত্র ৩)

সূচিপত্র

প্রচ্ছদ : মৈত্রী ধর মজুমদার

সম্পাদিকা : **প্রব্রাজিকা আপ্তকামপ্রাণা** ব্যবস্থাপক সম্পাদিকা : **প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা**

দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-১৩২ স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ থেকে শ্রীসারদা মঠ ট্রাস্টিদের পক্ষে প্রব্রাজিকা আপ্তকামপ্রাণা কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭৬ থেকে প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য : ২৫ টাকা, বার্ষিক গ্রাহকমূল্য : ১৩০ টাকা, সডাক : ১৮০ টাকা

গ্রাহকের প্রতি

স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নসম্ভব শ্রীসারদা মঠের মুখপত্র 'নিবোধত'। এটি দ্বিমাসিক পত্রিকা। বছরে ছয়টি সংখ্যা যথাক্রমে মে, জুলাই, সেপ্টেম্বর, নভেম্বর, জানুয়ারি ও মার্চের ১ তারিখে প্রকাশিত হয়। সেপ্টেম্বর সংখ্যাটি পূজাসংখ্যা এবং জানুয়ারি সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যা।

By Hand Delivery/ Group

One Year - Rs. 130/-
Two Years - Rs. 260/-
Three Years - Rs. 350/-

By Post Delivery with Puja edition registry

1 Year - Rs. 180/- + Rs. 50/- = Rs. 230/-
2 Years - Rs. 360/- + Rs. 100/- = Rs. 460/-
3 Years - Rs. 500/- + Rs. 150/- = Rs. 650/-

Single register post

1 Year - Rs. 180/- + Rs. 140/- = Rs. 320/-
2 Years - Rs. 360/- + Rs. 280/- = Rs. 640/-
3 Years - Rs. 500/- + Rs. 420/- = Rs. 920/-

For Life Member - 30 Years - Rs. 6,000/-
Mokshaprana Endowment Fund
25 Years - Rs. 6,100/-

By Airmail : Rs. 3000/- per year
(Please add Rs. 1000/- if taken by Registered Post)
We request Airmail subscribers to provide us with
Whats App number and e-mail ID

কার্যালয় খোলা থাকার সময় (রবিবার, বুধবার বন্ধ)
সকাল ১০টা—১টা
বিকাল : (এপ্রিল—সেপ্টেম্বর) ২-৩০মি.—৫টা
(অক্টোবর—মার্চ) ২-৩০মি.—৪-৩০ মি.
কার্যালয় বিভাগের দূরভাষ : 6290649529, 9674355380
সম্পাদনা বিভাগের দূরভাষ : 9903491929
যোগাযোগ : সকাল ১১টা—১২টা, বিকেল : ৪—৫টা

কার্যালয়ের ঠিকানা
নিবোধত পত্রিকা,
শ্রীসারদা মঠ
দক্ষিণেশ্বর,
কলকাতা-৭০০ ০৭৬

অন্বেষা

ন তেন পণ্ডিতো হোতি যাবতা বহুভাসতি।
খেমী অবেরী অভয়ো পণ্ডিতো তি পবুচ্চতি॥

যদি কেউ বহু বাক্য বলে, তবে সে তার দ্বারা পণ্ডিত হয় না। যিনি নিরাপদ, শত্রুহীন এবং যাঁর থেকে কোনও ভয়ের সম্ভাবনা নেই, তিনি পণ্ডিত বলে কথিত হন।[১]

—ভগবান বুদ্ধ

তুমি জান যে, মৃত্যু অনিবার্য; মৃত্যু আছে জলে বাতাসে—প্রাসাদে বন্দিশালায়—সর্বত্র। কোন্ বস্তু তোমাকে অভয় প্রদান করিবে? তুমি অভয় পাইবে তখনই, যখন তুমি তোমার স্বরূপ জানিতে পারিবে, জানিবে—তুমি অসীম, জন্মহীন, মৃত্যুহীন আত্মা; আত্মাকে অগ্নি দহন করিতে পারে না, কোন অস্ত্র হত্যা করিতে পারে না, কোন বিষ জর্জরিত করিতে পারে না। মনে করিও না—ধর্ম শুধু একটা মতবাদ, কেবল শাস্ত্রজ্ঞান। ধর্ম কেবল তোতাপাখির মুখস্থ বুলি নয়।... তুমি সারাক্ষণ প্রার্থনা করিতে পার, জগতের সব শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে পার, যত দেবতা আছেন, সকলের পূজা করিতে পার, কিন্তু যতক্ষণ না আত্মানুভূতি হইবে—ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি নাই। বাগাড়ম্বর নয়, তত্ত্বালোচনা নয়, যুক্তিতর্ক নয়, চাই অনুভূতি। ইহাকেই আমি বলি—বাস্তব জীবনে পরিণত ধর্ম।[২]

—স্বামী বিবেকানন্দ

১। দ্রঃ চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত, অনূদিত ও প্রণীত, সম্পাদনা ড. বারিদবরণ ঘোষ, *ধম্মপদ*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৯, ধম্মট্‌ঠবগ্‌গো (৩), পৃঃ ১০৭-০৮

২। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, খণ্ড ৩, ১৯৯৯, পৃঃ ১৯৫-৯৬

পরিক্রমা

যশোধরা

তখন তরুণ ছিল অরুণ-আলো। পৃথিবীকে তারণ করতে নেমেছিলেন 'সদয়হৃদয়' করুণার অবতার। অবতারদের মধ্যে তিনিই প্রথম সন্ন্যাসী। রাম আর কৃষ্ণ অবতারে যুদ্ধ ছিল ধর্মসংস্থাপনের প্রধান মাধ্যম—এবারে রাজপুত্র হয়েও তাঁর শক্রদমনের অস্ত্র ত্যাগ, সংযম। জীবশিক্ষার মাধ্যম শাসন নয়, শাস্তিও নয়—অপরিমেয় করুণা।

অবতারলীলা সম্ভব হয় শক্তির সাহায্যেই। 'ন চেদেবং দেবঃ ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি'—শক্তি ছাড়া শিব নিশ্চল, স্পন্দনেরও ক্ষমতা রাখেন না। 'শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি' তাহলেই তিনি 'শক্তঃ প্রভবিতুম্'—'হতে পারেন' অর্থাৎ জন্মাতে পারেন, বা বলা ভাল কিছু করতে পারেন। তাঁদের শক্তিও তাঁদের সঙ্গে দেহধারণ করে লীলা করেন।

শক্তিই সর্বার্থসাধিকা, তবু তিনি রহস্যপ্রিয়া, লীলারঙ্গিণী। সব অবতারের পাশেই তিনি অতি শান্ত, মৃদু, অন্তর্মুখিনী, এমনকী কখনও নির্বাসিতা, কখনও পরিত্যক্তা। বুদ্ধলীলায় শক্তিকে সর্বতোভাবে অবতারের জীবনচর্যার অনুগামিনী দেখতে পাই।

ভগবান বুদ্ধ জন্মেছিলেন কপিলাবস্তুর রাজকুলে। 'ললিতবিস্তর' গ্রন্থ সুললিতভাবে বিস্তারিত করেছেন অবতার আর তাঁর শক্তির মানবলীলা। অতুল বৈভবে লালিত কুমার যখন ষোড়শ বর্ষীয় কিশোর, তখন পিতা শুদ্ধোদন আর অমাত্যবর্গের মনে জাগল তাঁর বিবাহের চিন্তা, কারণ দৈবজ্ঞের ভবিষ্যদ্‌বাণী তাঁদের সর্বদাই শঙ্কিত রাখত। কুমার যদি সন্ন্যাসী হন তবে তিনি সম্যক সম্বুদ্ধ হবেন, আর সংসারী হলে চতুরঙ্গ সেনাসমন্বিত বিজিতবান চক্রবর্তী রাজা হবেন; চক্ররত্ন হস্তিরত্ন অশ্বরত্ন মণিরত্ন স্ত্রীরত্ন গৃহপতিরত্ন পরিণায়করত্ন—এই সপ্তরত্ন তাঁর কাছে যেচে আসবে।

রাজা বুঝতেন, কুমারকে বিবাহের ব্যাপারে কিছু বলা কঠিন। তবু তিনি সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কেমন কন্যা পছন্দ। কুমার অসম্মতি বা বিরাগ প্রকাশ তো করলেনই না; বরং সকলকে আশ্চর্য করে জানালেন, তিনি সপ্তম দিনে উত্তর দেবেন।

প্রথমেই তিনি ভাবলেন—"আমি কামভোগের অনন্ত দোষ জানি (বিদিতং ময়ানন্তকামদোষাঃ), যে-আমি সমাহিত শান্তচিত্ত হয়ে উপবনে বাস করব সেই আমার তো সংসারে বাস শোভা পায় না! তবে বোধিসত্ত্বগণ দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য গৃহিজীবন যাপন করেছেন—আসক্তও হননি, সমাধি থেকে ভ্রষ্টও হননি। আমি লোককল্যাণের জন্য তাঁদেরই মতো হব।" সাতদিন ধরে বিবেচনা করে সিদ্ধার্থ প্রকাশ করলেন তাঁর ভাবী সহধর্মিণীর গুণের দীর্ঘ তালিকা। বধূ হবেন অসামান্যা। বংশ-গোত্র হবে অতিশুদ্ধ, রূপ-গুণ-শিক্ষা হবে অপরিমেয়। অনুপম রূপযৌবনবতী হলেও রূপের গর্ব থাকবে না তাঁর। মন পূর্ণ থাকবে সকলের প্রতি

মৈত্রীভাবনায়। ভিক্ষুক ও ব্রাহ্মণদের প্রতি দানশীলা হবেন তিনি। মনে স্থান পাবে না মান, অহংকার, শঠতা, ঈর্ষা, ছলনা, গর্ব, ঔদ্ধত্য, প্রগলভতা, চাঞ্চল্য। লোভ থাকবে না পানভোজনে, রসশব্দগন্ধে। সদা সত্যে স্থিত বধূর মন কখনও ভ্রান্ত হবে না। তিনি হবেন বসনে ভূষণে লজ্জাশীলা, ধার্মিক, কায়মনোবাক্যে পরিশুদ্ধা। তন্দ্রা, আলস্য তাঁকে স্পর্শ করতে পারবে না। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, দাসদাসীর প্রতি স্নেহ, শাস্ত্রজ্ঞান, ধর্মাচরণ তাঁর চরিত্রের অলংকার হবে। এককথায়—তিনি হবেন সকলের মায়ের মতো এবং অকৃত্রিম মৈত্রী অনুবর্তিনী।

কুমারের মনের কথা জেনে অনুরূপ পাত্রীর সন্ধান চলল। অবশেষে দণ্ডপাণি, মতান্তরে সুপ্রবুদ্ধ শাক্যের গৃহে দেখা মিলল তাঁর। অনুপমা কন্যাটি বৌদ্ধসাহিত্যে অধিকাংশক্ষেত্রেই রাহুলমাতা নামে অভিহিত হয়েছেন। ললিতবিস্তর অনুসারে তাঁর নাম যশোধরা বা গোপা। আরও বহু নাম তাঁকে উদ্দেশ করেছে : ভদ্দকচ্চানা (ভদ্রকাঞ্চনা অর্থাৎ উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণা), বিম্বাদেবী, বিম্বাসুন্দরী, সুভদ্দকা। অভিধানকার মললশেখরের মতে তাঁর আসল নাম বিম্বা, অন্যগুলি বিশেষণ। জিনচরিত থেকে জানা যায়, কমলের মতো কোমল ও সুন্দর তাঁর আনন ও সর্বাঙ্গ, নীলপদ্মের মতো চোখ, তরঙ্গায়িত ভ্রূ, ফেনায়িত হাসি, দেহ যেন জ্যোৎস্নায় উদ্‌ভাসিত।

কন্যার জন্ম ৫৮৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বৈশাখী পূর্ণিমায় নেপালের পার্বত্য প্রদেশে, রোহিণী নদীর তীরে কপিলাবস্তু নগরে—সিদ্ধার্থের সঙ্গে একইদিনে। মা অমিতা, ভাই দেবদত্ত। বধূর গুণাবলি একটি গাথাতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন সিদ্ধার্থ। সে-গাথা পড়ে কন্যা তাঁর গৃহে পাত্রীর সন্ধানে-আসা পুরোহিতকে সপ্রতিভভাবে জানালেন, এই সমস্ত গুণই তাঁর মধ্যে আছে। অতএব বিবাহ যদি করতেই হয় তবে বিলম্ব কেন? আর একটি শঙ্কাও কন্যা প্রকাশ করে ফেললেন : ''মা হীন-প্রাকৃতজনেন ভবেয় বাসঃ''—আমাকে যেন কোনও হীন, প্রাকৃতজনের সঙ্গে বাস করতে না হয়! তাই সেই শোভন, রূপবান কুমারই আমার পতি হোন—''স মে পতির্ভবতু সৌম্য সুরূপরূপঃ।''

শুদ্ধোদন এসব শুনে চিন্তা করলেন, গোপা সত্যিই সর্বগুণান্বিতা হলে কুমার তাঁকে অবশ্যই মনোনীত করবেন; কিন্তু কুমারও অসামান্য—তাঁকে নিজের সহধর্মিণী নিজেকেই নির্বাচন করতে দেওয়া উচিত। পরিকল্পনামতো রাজার সংস্থাগারে একদিন শাক্য কুমারীদের নিমন্ত্রণ করা হল। তাদের সম্মানিত করার জন্য রাখা ছিল মণিরত্নপূর্ণ 'অশোকভাণ্ড'। কুমারীরা সিদ্ধার্থের পবিত্র তপোময় প্রভাব সহ্য করতে না পেরে তাঁর হাত থেকে উপহার নিয়ে দ্রুত ফিরে গেল। অশোকভাণ্ডগুলি শেষ হয়ে গেলে যশোধরা এলেন। সকৌতুকে কুমারকে বললেন, ''আমায় সম্মানিত করলে না?'' কুমার উত্তর দিলেন : ''তুমি যে সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর এলে! আচ্ছা আমার এই আংটিটি নাও।''

শুনে রহস্য মিশল গোপার হাসিতে : ''এ তো আমার প্রাপ্যই!''

''তবে আমার সব অলংকার নাও!''

স্নিগ্ধ হেসে কন্যা জানালেন, তিনি কুমারকে নিরলংকার করবেন না—বরং পরস্পরের ইচ্ছাকেই অলংকৃত করবেন।

তাঁরা পরস্পরের মনোনীত হয়েছেন—এই সংবাদ পেয়ে শুদ্ধোদন কন্যার পিতাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। দণ্ডপাণি কিন্তু রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহের কথায় বিগলিত না হয়ে জানালেন, তাঁর কন্যা 'বীর্যশুল্কা' হবেন, অর্থাৎ বীরত্বই হবে কন্যার শুল্ক। 'শিল্পজ্ঞ'—সকল বিদ্যায় পারদর্শী পাত্রকে কন্যাদানই তাঁদের কুলধর্ম। সিদ্ধার্থ আজন্ম সুখলালিত, কোমলমতি। শিল্পজ্ঞ নন তিনি, রণনীতিজ্ঞও না। কুমার সমস্ত বিদ্যায় নিজের

পারঙ্গমতা প্রমাণ করতে পারলে তবেই গোপার পাণিগ্রহণের অধিকারী হবেন।

একথা শুনে রাজা বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। কুমার তাঁকে আশ্বাস দিলেন : ‘‘আপনি সকল শিল্পজ্ঞকে একত্রিত করুন, আমি পরীক্ষা দেব।’’ পাঁচশো শাক্য কুমার নির্দিষ্ট দিনে সমবেত হলে অসিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, শরনিক্ষেপ, লিপিজ্ঞান, সংখ্যাজ্ঞান প্রভৃতি শতাধিক বিষয়ে সিদ্ধার্থ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন। ধুমধাম করে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।

শ্বশুরকুলে যশোধরা শ্রদ্ধা-ভালবাসা-সেবা দিয়ে সকলের হৃদয় জয় করলেন। নববধূ অবগুণ্ঠন দেন না দেখে হয়তো সমালোচনা হত, তারই উত্তরে তাঁর মুখে ‘ললিতবিস্তর’ শুনিয়েছেন এক দীর্ঘ গাথা। তাতে গোপা বলছেন, যার ইন্দ্রিয় বশীভূত, বিষয় থেকে বিরত বলে মন প্রসন্ন, তার অবগুণ্ঠনে কী প্রয়োজন? চরিত্র আর গুণই তাঁর অমোঘ আবরণ—বসনের আবরণ দিয়ে তিনি কী করবেন?

সিদ্ধার্থ-গোপাকে সুখে রাখতে রাজার ত্রুটি ছিল না। গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও বর্ষা কালে তিনটি পৃথক প্রাসাদে তাঁরা থাকতেন। চারদিকে মনোরম উদ্যান, অসংখ্য রকম ফলফুলের গাছে পূর্ণ। বিলাসের অচিন্তনীয় আয়োজন। অপরিসীম আনন্দে তেরোটি বছর কাটল। তারপর জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত দুটি মানুষ, মৃতদেহ ও সন্ন্যাসী দেখে এবং বৈরাগ্যোদ্দীপক গান শুনে সিদ্ধার্থের মনে বোধিসত্ত্ব সংস্কার জেগে উঠল, তিনি গৃহত্যাগের সংকল্প করলেন।

সিদ্ধার্থকে বিমনা ও অন্তর্মুখ দেখে এবং তাঁর গৃহত্যাগ সংক্রান্ত একটি দুঃস্বপ্ন দেখে গোপা এ-বিষয়ে একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে সিদ্ধার্থ তাঁর হৃদয় খুলে দিলেন। ‘‘সংসারের দুঃখসাগর থেকে মানবকে ত্রাণ করতেই আমার জন্ম। অনিত্য সুখ ভোগ করতে আমি আসিনি। মানুষের দুঃখ দেখে আমার হৃদয় কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারে না’’—বলতে বলতে সিদ্ধার্থ অধীর হয়ে কাঁদতে লাগলেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁর ‘Buddha and Yashodhara’ পুস্তিকায় গৃহত্যাগের আগে সিদ্ধার্থের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ করেছেন অতুলনীয় ভঙ্গিতে। কুমার ভাবছিলেন, সত্যের সন্ধান পেয়ে তিনি তা লুকিয়ে রাখবেন না, নির্বিচারে সকল মানবের কাছে প্রকাশ করবেন। তবু তাঁর মনে হচ্ছিল, বিশ্বের জন্য নিজেকে বলি দেওয়া খুব ভাল কাজ হতে পারে, কিন্তু স্ত্রীপুত্রকে বলি দেওয়ার অধিকার তাঁর আছে কি? এই দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েও গৌতম এক নতুন আলো পেলেন। তাঁর মনে হল, গোপা অসামান্যা—তাঁর উদার মহৎ মনের পরিচয় তিনি তো বহুবার পেয়েছেন! তিনি যে-আত্মোৎসর্গ করতে চলেছেন তাতে যশোধরারও অংশ আছে। তিনিও সিদ্ধার্থের তপস্যা, মহিমা ও জ্ঞানের অর্ধাংশ লাভ করবেন।

ললিতবিস্তরের মতে সিদ্ধার্থের ছাব্বিশ বছর বয়সে পুত্র রাহুলের জন্ম হয় এবং ঊনত্রিশ বছর বয়সে তিনি সংসারত্যাগ করেন। মহাবস্তু অবদানের মতে তাঁর গৃহত্যাগের রাত্রে রাহুল মাতৃকুক্ষিতে প্রবিষ্ট হন এবং জন্মান্তরীণ কর্মক্ষয়ের জন্য ছ-বছর সেখানে বাস করেন। প্রাচীন তিব্বতি সাহিত্য ‘ভদ্রকল্পাবদান’ও স্বীকার করেছেন যে মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশের ছ-বছর পর বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে সিদ্ধার্থের বোধিলাভের ক্ষণে রাহুলের জন্ম। এছাড়া অধিকাংশ গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে, রাহুলের জন্মের রাত্রেই সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করেন। সেদিন ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমা। গোপার নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় সদ্যোজাত পুত্রকে না দেখেই তিনি চলে গেলেন।

সিদ্ধার্থের ‘মহাভিনিষ্ক্রমণে’র পর তাঁর পিতামাতা ও পত্নীর হৃদয়বিদারী বিলাপ বর্ণনা করেছেন ললিতবিস্তর, বুদ্ধচরিত এবং আরও বহু পালি গ্রন্থ। অবশেষে প্রাথমিক অভিঘাত কাটিয়ে উঠে গোপা ভাবলেন—‘‘সবই তো অনিত্য, তাহলে আমি কেন শোকে মুহ্যমান হয়ে আছি! তাঁর মতো আমিও

ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে তপস্যা করব।" তা-ই করতে আরম্ভ করলেন তিনি।

ছ-বছর পর সিদ্ধার্থ বোধিলাভ করে 'বুদ্ধ' হলেন। তার কিছু পরে রাজা শুদ্ধোদনের আমন্ত্রণে তিনি পাঁচশো ভিক্ষু সহ কপিলাবস্তুতে আসেন। রাজপ্রাসাদে মাতা গৌতমীর তত্ত্বাবধানে ভিক্ষা গ্রহণ করে সকলের কাছে ধর্মদেশনা করলেন তিনি। সেই সভায় গোপা এলেন না, আত্মমর্যাদা রক্ষা করে বললেন, "গোপার যদি ধর্মবল থাকে, তবে বুদ্ধ স্বয়ং তার কাছে আসবেন।" সত্যিই, গোপাকে অনুপস্থিত দেখে ভগবান বুদ্ধ তাঁর দুই প্রধান শিষ্যকে নিয়ে তাঁর কক্ষে এলেন। তাঁর চরণস্পর্শে গোপার শোকানল একেবারে নির্বাপিত হল। তাঁর অভাবনীয় সংযম তাঁকে মুহূর্তে আত্মস্থ করে দিল। শুদ্ধোদন গোপার কঠোর তপস্যা ও বৈরাগ্যের কথা বুদ্ধদেবকে জানালে তিনি 'চণ্ডকিন্নর' জাতকের গল্প শোনালেন। সকলে বুঝল, পূর্ব পূর্ব জীবনেও গোপা বোধিসত্ত্বের একনিষ্ঠ সহধর্মচারিণী ছিলেন।

মহাবস্তু অবদান থেকে এই সময়কার মর্মস্পর্শী ঘটনাবলি জানা যায়। ভগবান বুদ্ধ আসবার পর শাক্যরা পরামর্শ করে স্থির করেছিলেন, রাহুলকে বলা হবে না যে সে বুদ্ধপুত্র। তাকে একথা জানানোর শাস্তি প্রাণদণ্ড। এদিকে বুদ্ধদেব শুদ্ধোদনের অনুরোধে নিত্য রাজপ্রাসাদে ভিক্ষা নিতে আসছেন। শিশু রাহুল তাঁকে দেখে মুগ্ধ, তাঁর প্রায় গা ঘেঁষে বসে সে। একদিন মাকে সে জিজ্ঞাসা করল তার বাবা কোথায় গেছেন। যশোধরা মিথ্যা প্রবোধ দিলেন—বললেন তার বাবা দক্ষিণাপথে গেছেন বাণিজ্য করতে। শিশু বুদ্ধিমান, সে বলল, "তাহলে কেন তিনি আমার জন্য কোনও উপহার পাঠাচ্ছেন না?" মা আবার সান্ত্বনা দিলেন : "ক্ষত্রিয়রা তাঁকে আটকে রেখেছে।" হঠাৎ রাহুল বুদ্ধের কথা বলল : "আচ্ছা মা, ওই শ্রমণটি কি আমাদের কেউ হন? ওঁর ওপর আমার এত টান হচ্ছে কেন?" বারবার সে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগল—"উনি আমার কে হন, মা?"

শাস্তি মৃত্যু জেনেও গোপা আর পুত্রকে প্রবঞ্চনা করতে পারলেন না। বাতায়নে দেখলেন ভিক্ষুসঙ্ঘের পুরোভাগে আসছেন ভগবান শাস্তা। রাহুলকে বললেন, "কর্ণিকার পুষ্পের মতো স্বর্ণবর্ণ অতিসুন্দর মানুষটি, যাঁর শীলকর্মের চন্দনগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত, যিনি ধ্যানে প্রতিষ্ঠিত, সিংহের মতো বীর্যবান, বত্রিশ রকম মহাপুরুষ-লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত, তিনিই তোমার পিতা।"

সপ্তম দিবসে প্রাসাদে ভিক্ষা নিয়ে বুদ্ধ যখন ফিরে যাচ্ছেন, গোপা রাহুলকে বললেন, "যাও, পিতার কাছে উত্তরাধিকার চেয়ে নাও।" সে ভগবানের চীবরপ্রান্ত ধরে পিতৃধন চাইতে চাইতে চলল। বুদ্ধদেব তাকে প্রব্রজ্যা দিতে মনস্থ করলেন।

এই সংবাদ পেয়ে গোপা রাহুলকে কোলে করে বোঝাতে লাগলেন যে রাজসুখে অভ্যস্ত সে, ভিক্ষুর কঠোর জীবন সে যাপন করতে পারবে না। প্রত্যুৎপন্নমতি রাহুল বলল, "আমার পিতা কি রাজকুলে বড় হননি? তিনিও কি রাজসুখে অভ্যস্ত ছিলেন না? তিনি যদি পেরে থাকেন আমি পারব না কেন?" সাত বছরের শিশু তার পিতার মতো তেজ প্রকাশ করে বলল, "আমার ধৈর্য আছে, মনোবল আছে। আমি প্রব্রজ্যা নেব এবং অবশ্যই নির্বাণলাভ করব।" যশোধরা পুত্রকে দৃঢ়সংকল্প দেখে তাকে শ্রমণ-জীবনের উপদেশ দিলেন। এই উপদেশ দেশকাল নির্বিশেষে ত্যাগের পথিকের চিরন্তন প্রেরণা। গোপা বললেন, "ছয় ইন্দ্রিয়ের দ্বার সযত্নে রক্ষা কোরো, আহার-নিদ্রার মাত্রা বিষয়ে সর্বদা সজাগ থেকো। বীরত্ব সহকারে কর্ম কোরো। বুদ্ধের সম্পূর্ণ অনুশাসন হৃদয়ে ধারণ কোরো, কখনও ভুলো না। নির্বাণলাভ পর্যন্ত অত্যন্ত সংযত থেকো। সুসজ্জিতা সুন্দরীরা বুদ্ধকে বন্দনা করতে আসবেন, তাঁদের মায়ের মতো দেখো।"

মহাবস্তু অবদানের বর্ণনায় দেখা যায়, রাহুলের মস্তক মুণ্ডনের পর তার কোঁকড়ানো কেশকলাপ কোলে নিয়ে গোপা হাত বোলাচ্ছেন, মুণ্ডিতশির শিশুপুত্রকে দেখে তাঁর অশ্রু বাধ মানছে না।

কয়েক বছর পরের কথা। প্রায় সাতানব্বই বছর বয়সে শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর শাক্যবংশে শূন্যতার সৃষ্টি হল, কারণ বুদ্ধের সঙ্ঘে ভিক্ষু হয়ে যোগ দিয়েছিলেন বহু শাক্য পুরুষ। তার উপর কোশলরাজ প্রসেনজিতের পুত্র প্রবল শাক্যবিদ্বেষী বিদুডভের আক্রমণে ও নিষ্ঠুর হত্যালীলায় কপিলাবস্তু প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল। এর ফলে অন্তঃপুরিকারা অরক্ষিত বোধ করলেন। ভগবান বুদ্ধ তখন আছেন বৈশালী রাজ্যের কূটাগারশালায়। মাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমী, যশোধরা সহ পাঁচশো শাক্য নারী পদব্রজে সেখানে উপস্থিত হলেন—দীর্ঘ পথশ্রমে অনাহারে শ্রান্ত, ধূলিমলিন অবস্থায়। এতদিন তাঁরা গৃহেই উপাসিকার জীবন কাটাচ্ছিলেন, এখন সঙ্ঘে যোগদানের অনুমতি চাইলেন।

ভগবান প্রথমে অসম্মত হলেও একান্ত সেবক আনন্দের বারবার আবেদনে আটটি শর্তসাপেক্ষে নারীদের সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

নিরন্তর তপস্যায় যশোধরা কয়েক বছরের মধ্যেই অর্হৎ হলেন। বুদ্ধের কাছে উপসম্পদা গ্রহণের পর সঙ্ঘে তাঁর নাম হয়েছিল 'ভদ্দকচ্চানা থেরী'। ভিক্ষুণীদের মধ্যে তিনিই প্রথম 'মহাভিজ্ঞা' লাভ করেন। আটাত্তর বছর বয়সে তিনি উপলব্ধি করলেন তাঁর মহানির্বাণ আসন্ন। বুদ্ধ তখন মগধের রাজধানী রাজগৃহে। সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অন্তিম বন্দনা করে গোপা বললেন, ''আজ রাত্রে আমি পরিনির্বাণ লাভ করব। আমি অসংখ্য জন্মে আপনার সহধর্মিণীরূপে দেহধারণ করেছি। আমার কোনও সেবাপরাধ হয়ে থাকলে মার্জনা করুন। আর বুদ্ধের অনুসারী পরিষদের কাছে আমার আবেদন : যদি কায়মনোবাক্যে কারও কাছে কোনও অপরাধ করে থাকি তবে তিনি যেন আমায় ক্ষমা করেন।''

ভগবানের কণ্ঠে ঝরল জন্মান্তরীণ সখ্য আর প্রেম : ''তুমি মৃত্যুকে জয় করেছ, তোমাকে আর কী বলার আছে? একটি মাত্র অনুরোধ, এই পরিষদে তোমার ঋদ্ধি প্রদর্শন করে এদের বিশ্বাস দৃঢ় করো।''

যশোধরা ছাড়া বুদ্ধশিষ্যদের মধ্যে মাত্র তিনজন—সারিপুত্ত, মৌগ্‌গল্লায়ন ও বক্কল ঋদ্ধিসম্পদের অধিকারী ছিলেন। ঐশী শক্তিবলে ঋদ্ধি প্রদর্শন করে যশোধরা নিজের ও ভগবান বুদ্ধের অতীত জন্মগুলির বৃত্তান্ত সকলকে শুনিয়ে শেষে বললেন, ''আমার সকল ক্লেশ দূর হয়েছে, সকল কর্ম ক্ষীণ হয়েছে, সকল কর্তব্যও শেষ হয়েছে। আমি বিষয়তৃষ্ণা সম্পূর্ণ পরিহার করে নির্লিপ্ত জীবন যাপন করছি।''

সে-রাতে গোপা মহাপরিনির্বাণ লাভ করলেন।

আধুনিক দৃষ্টিতে যশোধরা 'দৃপ্তচ্ছন্দ কবিতা'। সহজ সরল নিঃসংকোচ সপ্রতিভ তাঁর ব্যক্তিত্ব। তিনি যে সিদ্ধার্থের কাম্য গুণাবলির অধিকারিণী তা জানাতে তাঁর বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই! ষোড়শী কিশোরী সরল ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন : চরিত্রই মানুষের রক্ষক, অবগুণ্ঠন নয়। সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের পর অসহ বেদনাকে সংহত করে সন্ন্যাসী স্বামীর ও নিজের মর্যাদা রক্ষা করেছেন; সহজ অনাসক্তিতে উপলব্ধি করেছেন—''আমি কেন শোকে মুহ্যমান হয়ে আছি!'' ত্যাগোন্মুখ রাহুলের প্রতি উপদেশ তাঁর বাস্তববোধ আর আচার্যশক্তির পরিচায়ক। তখন তিনি অন্তঃপুরিকা, কিন্তু তাঁর বাণী যেন সঙ্ঘজীবনে অভ্যস্ত যথার্থ শ্রমণের। অশ্বঘোষ তাঁর 'বুদ্ধচরিতে' একটি শ্লোকে যশোধরাকে বলেছেন বুদ্ধের 'স্বযশোধরা'। আমরাও তাই বলি। নিজ চরিত্র আর গুণাবলি দিয়ে বুদ্ধাবতারের যশোরাশি তিনি রক্ষণ করে গেছেন। তাঁর তৃষ্ণাজয়, নির্লিপ্ত জীবন, দুর্লভ ঋদ্ধি ও সিদ্ধি তাঁর চরণে আমাদের আনত করে।

দৈব ও পুরুষকার

স্বামী সুহিতানন্দ

উপনিষদে আছে, ''তচ্ছৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।'' অর্থাৎ ভগবান জগৎ সৃষ্টি করে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। গীতাতেও আছে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রও তিনি, ক্ষেত্রজ্ঞও তিনি। পুরুষসূক্ত বলছে ভগবান নিজেকে বিস্তার করলেন—চতুর্দশ ভুবন, জীব, জীবন, ভোগ, মুক্তি সবই তিনি নিজেই হলেন। কীভাবে সৃষ্টি করলেন? মায়া বা অজ্ঞান অবলম্বনে। প্রথমে বিদ্যামায়া অবলম্বনে নিজেকে বহু করলেন; সকলে আমি-আমি করতে লাগল। তখন অবিদ্যামায়ার সাহায্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনগুণ তৈরি হল। তিনগুণ মিলে বুদ্ধি, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, দেহ এবং পঞ্চভূত—ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম তৈরি হল। প্রতিটি 'আমি' এদের সাহায্যে চতুর্দশ ভুবন ভোগ করতে লাগল।

যেহেতু প্রতি আমি সমষ্টি-আমির সত্তা তাই প্রতি আমি ভাবে 'আমি সব', যেমন যে-পরিবারে আমরা জন্মাই সেই পরিবারকে সেই বংশকে আমার মনে করি। যেমন আগুনের ফিনকির মধ্যে আগুনের সব ধর্ম ও ক্ষমতা থাকে। তাই প্রত্যেক 'আমি' ভাবে আমি স্বাধীন এবং যা খুশি করতে পারি।

আজ সকালে বেড়াতে বেড়াতে মনে হল 'দৈব ও পুরুষকার' চিন্তাটা লিখে ফেলব। ঘরে এসেই দেখি নাপিত অপেক্ষা করছে—একটু আগে এসে পড়েছে, তার কী কাজের তাড়া আছে। তাকে attend করতে হল। ফলে যে-সময়ে লিখব ভেবেছিলাম সেই সময়টি পার হয়ে গেল এবং অন্য কাজে লাগতে হল। আমার পুরুষকার বলছে 'লিখে ফেলো' অথচ দৈব কোথা থেকে এসে সব তালগোল পাকিয়ে দিল।

আমাদের জীবনে দৈবও একটি অতি আবশ্যিক বিষয়। আমি জানি না জন্মের আগে কোথায় কীভাবে ছিলাম, জানি না শরীর ছাড়লে কোথায় যাব, কেমন থাকব। জানি না প্রতি কাজের সঙ্গে একটা uncertainty ও probability কাজ করছে। সব ঠিক চলছে, হঠাৎ কিছু ঘটে গেল। সেখানে আমরা অসহায়। যেকোনও সময় কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাহলে কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব? তা পারব না। আমার প্রকৃতিতেই আমাকে কাজ করাবে। ''কর্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যসি হ্যবশোঽপি তৎ।''

অন্যতম সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

এই paradoxই জীবন। করলে সফল হতে পার, বিফল হতে পার—তথাপি করতে হবে।

যখন 'স্বভাবস্তু প্রবর্ততে'—স্বভাব আমাকে স্থির থাকতে দেবে না, তখন একটাই উপায়—কিছু করা। কী করব? যাঁরা জীবনে সফল হয়েছেন তাঁদের পথ ধরব। দু-প্রকারের সফলতা আছে। প্রথম, মনবুদ্ধিকে সবল করে জগতের ভোগ্যবস্তুকে ভোগ করা—অন্যের ক্ষতি না করে। অনেকে এভাবে জীবন সফল করেছেন। এরই মধ্যে একশ্রেণির মানুষ আছেন যাঁদের এই জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছে—এই জীবনেই হোক বা গতজন্মেই হোক (গতজন্মে হলে তাঁরা জন্মান্তরীণ সংস্কার নিয়ে আসেন)—তাঁরা জগতের বিষয়ভোগে রস পান না। তাঁরা আদর্শকেই জীবন ভাবেন। আদর্শ দেশ হতে পারে, গ্রাম হতে পারে, বিজ্ঞান হতে পারে, মানবসেবা হতে পারে। আর দ্বিতীয়, যার সব ভোগ শেষ হয়েছে ভোগত্যাগেই তার সুখ। সেটাই তার আদর্শ।

আদর্শ চরিত্রের নিদর্শন আমরা পাই শ্রীরামচন্দ্র চরিত্রে। জাগতিক শক্তিতে তিনি অপরাজেয়, মনুষ্যোচিত শুভগুণের তিনি পরাকাষ্ঠা অথচ তাঁর জীবন কী বেদনাময়! তিনি কী অন্যায় করেছিলেন, কী পাপ করেছিলেন, কোথায় কাকে কষ্ট দিয়েছেন যে কর্মফলরূপে তাঁকে এই যাতনাময় জীবন যাপন করতে হল? কৈকেয়ীর অন্ধ সন্তানস্নেহের জন্য, দশরথের চরিত্রের দুর্বলতার জন্য কেন তাঁকে 'বলি' হতে হল? কেন বনবাস, কেন সীতাবর্জন, কেন লক্ষ্মণকে ত্যাগ, কেন সরযূতে আত্মবিসর্জন? কেন লক্ষ্মণের ও সীতার এত আত্মবিলয়?

এত প্রবল পুরুষকারের অধিকারী হয়েও রামচন্দ্র পদে পদে দৈবের ঘটনাপ্রবাহের কাছে অসহায়। শক্তি থেকেও শক্তিপ্রয়োগের অধিকার থেকে বঞ্চিত। কেন? জাগতিক ঘটনাপ্রবাহের নিরিখে কোনই সদুত্তর পাওয়া যাবে না। নিষ্ঠুর মহামায়ার হাতে তিনি খেলনার মতো অসহায়। মহামায়ার যদি এমনই বিচার হয় তবে কেন মানুষ পুরুষকার দ্বারা নিজেকে উন্নত করতে চেষ্টা করবে? মানুষ উদ্যমহীন হয়ে নিজেকে প্রকৃতির হাতে সঁপে দিলেই তো শান্তি! না, তাতেও শান্তি নেই।

যতক্ষণ 'আমি' আছে ততক্ষণ উন্নতির জন্য চেষ্টা করতেই হবে। এ-ব্যাপারেও মানুষ অসহায় ক্রীড়নক। উপায় কী? উদ্দেশ্যই বা কী? শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করা হল, ঈশ্বর খারাপ লোক কেন করেছেন? তিনি বললেন, ভাল লোক করবেন বলে। যারা খারাপ কাজ করবে না তারাই ভাল হবে।

পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ ছিল, আছে এবং থাকবে। কেন তাদের কথা কেউ মনে করে না? আর কেন রাম আজও কোটি কোটি হৃদয়ের দেবতা?—কারণ তাঁর আদর্শের জন্য সর্বস্বত্যাগ। মহামায়ার শত ভ্রূকুটিকে তাচ্ছিল্য করার শক্তি তাঁর মধ্যে ছিল—তাই তিনি মহান।

তাই দৈব অধিক শক্তিশালী হলেও আত্মশক্তিতে পুরুষকারযুক্ত মানব অনেক বড়—কোনও অস্ত্রই তার মহিমাকে ম্লান করতে পারে না। তাই সাবিত্রী আত্মশক্তিতে যমরাজার শক্তিকে পরাভূত করতে পেরেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ পুরুষকারের শক্তিতে সমাজে তখনই ঈশ্বরতুল্য অমিতশক্তিধর অজেয় পুরুষ। অথচ দৈবের প্রেরণায় তাঁর পিতামাতা কারারুদ্ধ। শৈশবে তিনি পরের দ্বারা পালিত। রাজপুত্র হয়েও গোপকুলে লালিত। নিত্য মৃত্যুভয়, অত্যাচার। কংসবধের পর মনে হল তিনি সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হবেন। না, তখন ধর্মের অপপ্রয়োগে সমাজ জীর্ণ—সাধারণ মানুষ অসহায়। প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজকুল উদীয়মান শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে নির্মূল করতে সর্বশক্তির প্রয়োগে তৎপর।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ রচনা করল শুভশক্তির জয়।

পঞ্চপাণ্ডবের জীবনও যেন paradox। বীরত্ব, শিক্ষাদীক্ষা, পৌরুষ—সর্বত্রই ভীমার্জুন অজেয়। তবু, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পাশে পাশে থাকলেও তাঁরা শক্তিপ্রয়োগে অসহায়, দৈবই প্রধান। দৈবের হাতে পুরুষকার ক্রীড়নক মাত্র। দৈব অনুকূল হলে পুরুষকার সফল, দৈব প্রতিকূল হলে পুরুষকার বিফল।

কিন্তু এই মহান চরিত্রগণ সফলতা বা বিফলতার মাপকাঠিতে চিহ্নিত হন না। তাঁদের চরিত্রের প্রধান বিষয় তাঁদের আদর্শ—সেই আদর্শের কাছে সফলতা-বিফলতা গৌণ। পঞ্চপাণ্ডব ধর্মপথের পথিক। রাম সত্যাচরণের প্রতীক।

ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, বুদ্ধকেও কত জন্ম চেষ্টা করতে হয়েছে। বুদ্ধের মনে ত্যাগ ও জিজ্ঞাসা কিন্তু পরিবেশ প্রতিকূল—তাই অসীম মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে সত্য উপলব্ধি করতে হয়েছে। মারের প্রলোভন জয়ই তো বুদ্ধের চরিত্রের মহিমা।

আচার্য শংকরকেও প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধেই সত্যসন্ধানে আসতে হয়েছে। শ্রীচৈতন্যকেও তাই।

তবে এঁদের সংগ্রাম বেশিরভাগই মানসিক। তাই পরিবেশের থেকেও ব্যক্তিগত জীবনে সংগ্রামের তীব্রতা প্রবল।

বুদ্ধ, যিশু, শংকর, চৈতন্য সকলের ক্ষেত্রেই দৈব তেমন প্রতিকূল বলে মনে হয় না কারণ তাঁরা সংসারে নিস্পৃহ, কেবল ঈশ্বরসত্তাতেই তাঁদের আগ্রহ। তাই প্রতি মুহূর্তে তাঁদের মনকে উচ্চগ্রামে রাখতে হয়েছে। তবেই জগৎ জগদ্‌গুরুকে পেয়েছে। ভগবান যিশু যেহেতু বিপরীত পরিবেশে ছিলেন, দৈব তাঁকে গ্রাস করে নিল; তথাপি সহস্র বৎসর ধরে তিনি সহস্র সহস্র মানুষের হৃদয়ের দেবতা কেন? কারণ তাঁর মানসিক শক্তি। নিজ আদর্শকে তিনি দৈবের কাছে বলি দেননি।

বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরামকে সত্যপালনের অপরাধে দৈবের হাতে নির্মম আঘাত পেতে হয়েছে। তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করেছেন ঈশ্বরসত্তাতে অবস্থান ছাড়া তাঁর আর কোনও গতি নেই—যদি তিনি সত্যকে ধরে থাকতে চান।

নরেন্দ্রনাথের জীবনে জাগতিক ঐশ্বর্য ছিল, এবং প্রকাশের সুযোগও ছিল; তথাপি পরিবেশ প্রতিকূল। প্রথম পিতার দেহত্যাগ, দ্বিতীয় কোনও চাকরি না পাওয়া, তৃতীয় বৈরাগ্যের তাড়না। পরস্পর বিপরীতমুখী আবেগের তাড়নায় তিনি ক্ষতবিক্ষত।

কিন্তু সবকিছুর শেষে আমরা দেখি, তাঁর দৈব প্রতিকূল বা অনুকূল যা-ই হোক না কেন, তিনি তাঁর লক্ষ্যে অচঞ্চল। ঈশ্বরলাভ না হওয়া পর্যন্ত, জগতকে ঈশ্বরের পথে নিয়ে যাওয়ার সোজা পথ তৈরি না করা পর্যন্ত তিনি শান্ত হতে পারেননি। যখন দেখলেন তিনি ঈশ্বরলাভ এবং অভ্যুদয়ের একত্র সমাবেশে এক নূতন সেবামার্গ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তখনই তিনি স্বেচ্ছায় মহানির্বাণ গ্রহণ করলেন।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জগতে অভ্যুদয়ের পথে দৈব একটি প্রতিবন্ধক শক্তি বটে, কিন্তু সংগ্রামের মাধ্যমেই অভ্যুদয় সম্ভব এবং এই সংগ্রামের ফলে বোধোদয় হয় যে দৈবের সঙ্গে অকারণ সংগ্রাম করে নিজেকে নাশ করার কোনও অর্থ হয় না; নিজেকে পেতে হলে ভগবানের পথে চলতেই হবে। স্বেচ্ছায় গেলে তুমি আনন্দে যাবে—না হলে জগৎ তোমাকে লাথি-ঝাঁটা মারতে মারতে ভগবানের দরজায় ঠেলে ফেলে দেবে।

তাই, 'ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো'। ✠

ধারাবাহিক রচনা

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের ইতিবৃত্ত

স্বামী চেতনানন্দ

পরিশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত এই গানটি স্বামীজী কিন্নর-কণ্ঠে গাইলেন :

''দুখিনী ব্রাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো করে।
কে রে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটির ঘরে॥
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয় সন্তাপহারী সাধ ধরি হৃদিপরে॥
ভূতলে অতুল মণি, কে এলি রে যাদুমণি
তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে।
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ কার তরে॥

''পরে তিথিপূজার নিয়মানুযায়ী একটি জীবিত মৎস্য বাদ্যোদ্যমের সহিত গঙ্গায় ছাড়া হইল। তারপর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য ভক্তদিগের মধ্যে ধুম পড়িয়া গেল।''[৬৫]

আমরা ১২৩ বছরের পূর্বের অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব দেখছি বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মাধ্যমে। পুরনো দিনের ওইসব কথা ও কাহিনি আমাদের মনে ঠাকুরের উৎসবের আনন্দ জাগায়। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে বা খুব সংক্ষিপ্তকারে প্রকাশ করলে উপভোগ করা যায় না এবং সম্পূর্ণ চিত্রও দেখা যায় না। বিভিন্ন গ্রন্থে স্মৃতিকথা ও পত্রাবলি প্রভৃতি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সুদীর্ঘকাল পরে জন্মোৎসবগুলির যথাসম্ভব পূর্ণচিত্র দর্শনই আমাদের লক্ষ্য।

প্রত্যক্ষদর্শী হরিচরণ মল্লিক ১৮৯৮ সালে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে ঠাকুরের উৎসব প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করেছেন।

''এই বাগানে একবার ঠাকুরের জন্মোৎসব। স্বামীজী কানে কুণ্ডল পরেছেন। ছাই মেখে একেবারে শিবটি সেজেছেন। তাঁর ডাকাবুকো চেলা গুপ্ত মহারাজকে বললেন, 'জি.সি.-কে (গিরিশবাবু) গেরুয়া পরা, ছাই মাখা।' একটা জটা ছিল, সেটা পরাতে বললেন, 'দে, দে ওকে ভৈরব সাজিয়ে দে।'

''গিরিশবাবু একটু কিন্তু কিন্তু করছেন। বলছেন, 'আরে, আমার সর্দি হয়েছে যে।' স্বামীজী ছাড়বার পাত্র নন। শেষে তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধে ছাই-টাই মেখে গিরিশবাবু হাসতে হাসতে বলছেন, 'তাই তো

অধ্যক্ষ, বেদান্ত সোসাইটি, সেন্ট লুইস

হে নরেন, এখন দেখছি, সর্দি একটু একটু করে কমে যাচ্ছে যে।'

''এই বাগানের ঠাকুরঘর ছিল ছপ্পর ও গোলপাতার চালা। মেজে ও দেওয়াল পাকা সিমেন্ট করা। স্বামীজী সকলকে নিয়ে তার ওপর বসলেন। বললেন, 'এইবার সবাই মিলে ধ্যান লাগাও।' গিরিশচন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপর তাঁর একটি মর্মস্পর্শী কবিতায় ঠাকুরকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'তব ধ্যান পরম উৎসব।' এইবারের অনুষ্ঠান থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন কি না জানি না।

''শরৎ মহারাজ তানপুরা হাতে গান করছিলেন। স্বামীজী ধ্যানের কথা বলাতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তানপুরার আওয়াজ থামালেন। স্বামীজী বললেন, 'তুই থামলি কেন রে?' তখন তানপুরার সুমিষ্ট তারের আওয়াজটুকু শরৎ মহারাজ ছাড়তে শুরু করলেন। সেই সঙ্গে সকল ভক্তদের ধ্যান চলতে লাগল।

''গুপ্ত মহারাজ এই সময়টায় ঠিক যেন ভৃঙ্গীর মতো একটা ডাণ্ডা নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন। স্বামীজী বললেন, 'শালা, খালি কুলিগিরি করবি কি? বোস, বোস, ধ্যান লাগা।' গুপ্ত মহারাজ সঙ্গে সঙ্গেই মিটিমিটি হাসতে হাসতে বলছেন, 'এ মহারাজ। ধেয়ান তো আতাহি নেহি।' কথামতো বসলেন অবশ্য। স্বামীজী এই সময় নিজে পাখোয়াজ বাজিয়ে স্বরচিত 'খণ্ডন ভববন্ধন' ভজনটি গাইলেন। হরি মহারাজ ঘণ্টা বাজালেন, কেউ বা কাঁসর ইত্যাদি। খুব চমৎকার জমল।

''শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে দিয়ে আমাদের কয়েকজনকে গায়ত্রী সূত্র দেওয়ালেন। লাল কম্বল একখানা গায়ে দিয়ে গড়গড়া হাতে সাক্ষিস্বরূপ সামনে দাঁড়িয়ে তিনি তখন তামাক খাচ্ছিলেন। ঐভাবে কোন কথা না বলে তিনি সকলের ভেতর শক্তিসঞ্চার করলেন। বাহ্যতঃ তিনি তামাক খাচ্ছিলেন বটে। কিন্তু চোখ দেখে বোধ হলো তিনি আত্মস্থ, ভেতরে ঢুকে রয়েছেন। কাজ হয়ে গেলে, লম্বাপানা কাপড়ে বাঁধা উপনিষদ্ ও শ্রীভাষ্য—বইগুলো আমাদের প্রত্যেকের মাথায় স্বামীজী ঠেকালেন। প্রশান্ত হয়ে আমাদের সবাইকে বললেন, 'তোদের আজ থেকে বেদে অধিকার করে দিলুম।' স্বামীজী নিজে সকলকে হাতে করে সূত্র দিলেন। সবাই আমরা অব্রাহ্মণ। মাস্টার মহাশয়ের দুই ছেলে—নটি, চারুও ছিল। প্রথমটা মাস্টার মহাশয় একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। ওঁর ছেলেদের সম্বন্ধে স্বামীজী বললেন, 'আপনার ছেলেদেরও এই সঙ্গে হয়ে যাক। আপনার খরচা বাঁচিয়ে দিচ্ছি।' মাস্টার মহাশয় একটু চুপ করে বলছেন, 'তুমি নিজে যদি দাও, তো দাও। আমার আপত্তি করবার কিছু নেই।' স্বামীজী বললেন, 'এ তো আমিই দিচ্ছি।' ''[৬৬]

১৮৯৮ সালের ঠাকুরের জন্মোৎসবের বিবরণ দিয়ে স্বামী প্রেমানন্দ ৬ মার্চ ১৮৯৮ মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখলেন :

''তিথিপূজার দিন সুশীল পূজা ও সুধীর তন্ত্রধারকের কার্য করিয়াছিল। ঐ দিন শতাধিক লোক প্রসাদ পাইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ একটি সুন্দর আরতির গান রচনা করিয়াছে :

খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়,
নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময়॥
নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত
মনোবচনৈকাধার
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর
তুমি তমোভঞ্জন হার।
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ আরতি তোমার॥

''সকলে সমবেত হয়ে আরতি করা হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ মস্তকে জটা, কর্ণে কুণ্ডল, গাত্রে বিভূতি ধারণ করায় এক অপূর্ব্ব শোভা হয়েছিল। আমরা

অনেকেই ঐরূপ সাজিয়াছিলাম।

''রাত্রি ১২টা পর্যন্ত পূজা-হোমাদি হইয়াছিল। ঐ দিন গঙ্গা ও সুরেন মহুলা হইতে একমণ ওজনের দুই ছানাবড়া লইয়া হাজির। স্বামীজী 'হিন্দুধর্ম্ম কি?'—এ সম্বন্ধে এক ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তোমায় একখানি পাঠাইব।''[৬৭]

শ্রীরামকৃষ্ণের এই আরাত্রিক গান সম্বন্ধে দুচার কথা বলা প্রয়োজন। বরানগর ও আলমবাজার মঠে ঠাকুরের আরতিকালে কাশীর বিশ্বনাথের আরতিস্তব গাওয়া হত। শ্রীম কথামৃতে লিখেছেন :

''সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে শশী ধুনা দিলেন। অন্যান্য ঘরে যত ঠাকুরের পট ছিল, সেখানে ধুনা দিলেন ও মধুর স্বরে নাম করিতে করিতে প্রণাম করিলেন।

''এইবার আরতি হইতেছে। মঠের ভায়েরা ও অন্যান্য ভক্তেরা সকলে করজোড়ে দাঁড়াইয়া আরতি দর্শন করিতেছেন। কাঁসর ঘণ্টা বাজিতেছে। ভক্তেরা সমস্বরে আরতির গান সেই সঙ্গে সঙ্গে গাইতেছেন :

জয় শিব ওঁকার, ভজ শিব ওঁকার।

ব্রহ্মা বিষ্ণু সদা শিব হর হর হর মহাদেব॥

নরেন্দ্র এই গান ধরাইয়াছেন। কাশীধামে বিশ্বনাথের সম্মুখে এই গান হয়।''[৬৮]

মনে হয় ঠাকুরের শুভ জন্মদিনে স্বামীজী ওই সংক্ষিপ্ত আরতির গান রচনা করেন এবং পরে আরও সাতটি শ্লোক জুড়ে একটি 'অষ্টপদী' রচনা করেছিলেন। আরাত্রিকটি গাওয়া হয় দুপুরে ভোগারতির সময়। স্বামীজী নিজে পাখোয়াজ বাজিয়ে গান, হরি মহারাজ ঘণ্টা বাজান এবং কেউ কাঁসর ইত্যাদি বাজান।

মহাপুরুষ মহারাজ পরবর্তী কালে এই আরাত্রিকের প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করেন :

''আগে মঠে আরতির সময় এ স্তোত্র গাওয়া হত না। তখন 'জয় শিব ওঙ্কার, ভজ শিব ওঙ্কার' ইত্যাদি বারংবার গাওয়া হত। তারপর স্বামীজী নিজে 'খণ্ডন-ভববন্ধন' এই স্তবটি রচনা করলেন, তাতে সুর দিলেন এবং সকলকে নিয়ে গাইতে শুরু করলেন। তিনি নিজেই পাখোয়াজ বাজিয়ে গাইতেন। সে কি অদ্ভুত দৃশ্য! একে তো তাঁর ভৈরবের মত দিব্যকান্তি শরীর; তার উপর ভাবে মাতোয়ারা হয়ে পাখোয়াজ বাজিয়ে যখন গাইতেন, সে যে কি এক গম্ভীর ভাবের সৃষ্টি হত তা আর কি বলব!''[৬৯]

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 'সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু' গ্রন্থে স্বামীজীর কণ্ঠ ও বাদ্যসংগীতে পারদর্শিতা সম্বন্ধে লিখেছেন :

''বেলুড় মঠের ঠাকুর ঘরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে [আরাত্রিক] গান করেছিলেন স্বয়ং পাখোয়াজ বাজিয়ে। গানটি ধ্রুপদাঙ্গের এবং চৌতালে গঠিত। ধ্রুপদ গান গাইবার সময়ে গায়কের সঙ্গে একযোগে মৃদঙ্গে সঙ্গত করা অতি কঠিন। একাধারে গান ও পাখোয়াজের সাধনায় দুর্লভ সিদ্ধিলাভের অধিকারী প্রতিভাধর ভিন্ন তা সম্ভব নয়। এবং এবিষয়ে বেশি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। একমাত্র স্বনামধন্য যদুভট্ট সম্পর্কে একথা শোনা যায়। সঙ্গীত জগতে বাংলার গৌরব যদুভট্ট আপনার গানের সঙ্গে আপনি মৃদঙ্গে সঙ্গত করতে পারতেন। দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত—স্বামীজী।''[৭০]

স্বামী অম্বিকানন্দ স্মৃতিচারণ করেছেন :

''মঠে আরতির স্তব 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন...' স্বামীজী থাকতে কীরূপ হতো জান? সব ঘণ্টা কাঁসরাদি যেমন চৌতালে বাজত, আরতি করতে করতে বাঁ-হাতে ঘণ্টাটিও তেমনি চৌতালে পূজারিকে বাজাতে হতো। বাবুরাম মহারাজ পূজারি। ঐ অবস্থায় অসুবিধা হচ্ছে দেখে তিনি ঘণ্টাটি অপরের হাতে দিয়ে শুধু আরতি করতেন।''[৭১]

২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ ঠাকুরের সাধারণ উৎসব (public festival) উদ্‌যাপিত হয় বেলুড়ের পূর্ণচন্দ্র

দাঁ-দের ঠাকুরবাড়িতে। স্বামীজী স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ৩০ নভেম্বর ১৮৯৭ লেখেন, ''নিজের জমিতে মহোৎসব করে তবে কাজ—তাতে বুড়োই মরে আর চেঁকড়াই ছেঁড়ে।''[৭২] কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। বেলুড়ে গঙ্গার ধারে মঠের জন্য জমি কেনা হল। তা ছিল আম, নারকেল, তাল, কলা, কচুগাছের জঙ্গলে পরিপূর্ণ। নদীর কিনারায় নৌকা মেরামত হত। খানাখন্দে ভরা এবড়ো খেবড়ো জমিকে সমান ও ব্যবহারযোগ্য করতে ব্যয় হয় প্রায় চার হাজার টাকা। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নতুন মঠের জমি ও বাড়ি তৈরির দায়িত্ব নেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮ স্বামীজী শশী মহারাজকে লেখেন : ''যে জমি কেনা হইয়াছে, আজ আমরা উহার দখল লইব এবং যদিও এখনই ঐ জমিতে মহোৎসব করা সম্ভবপর নহে, তথাপি রবিবারে উহার উপর আমি কিছু না কিছু করাইব। অন্ততঃ শ্রীজীর ভস্মাবশেষ ঐ দিনের জন্য আমাদের নিজস্ব জমিতে লইয়া গিয়া পূজা করিতেই হইবে।''[৭৩]

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি স্বামি-শিষ্য-সংবাদে লিপিবদ্ধ করেছেন :

''আজ নূতন মঠের জমিতে স্বামীজী যজ্ঞ করিয়া ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিবেন। শিষ্য পূর্বরাত্র হইতেই মঠে আছে। ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা দর্শন করিবে—বাসনা।

''প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া স্বামীজী ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পূজকের আসনে বসিয়া পুষ্পপাত্রে যতগুলি ফুল-বিল্বপত্র ছিল, সব দুই হাতে এককালে তুলিয়া লইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাদুকায় অঞ্জলি দিয়া ধ্যানস্থ হইলেন—অপূর্ব দর্শন! তাঁহার ধর্মপ্রভা-বিভাসিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল কান্তিতে ঠাকুর-ঘর যেন কি এক অদ্ভুত আলোকে পূর্ণ হইল! প্রেমানন্দ ও অন্যান্য স্বামিপাদগণ ঠাকুর-ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

''ধ্যানপূজাবসানে এইবার মঠভূমিতে যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল। তাম্রনির্মিত কৌটায় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভস্মাস্থি স্বামীজী স্বয়ং দক্ষিণ স্কন্ধে লইয়া অগ্রগামী হইলেন। অন্যান্য সন্ন্যাসিগণসহ শিষ্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শঙ্খ-ঘণ্টারোলে তটভূমি মুখরিত হওয়ায় ভাগীরথী যেন ঢল ঢল হাবভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে স্বামীজী শিষ্যকে বলিলেন—'ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাছতলাই কি, আর কুটিরই কি।' সেজন্যই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে নূতন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহু কাল পর্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।''

''এইরূপ কথাবার্তা হইতে হইতে সকলে মঠভূমিতে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী স্কন্ধস্থিত কৌটাটি জমিতে বিস্তীর্ণ আসনোপরি নামাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। অপর সকলেও প্রণাম করিলেন।

''অনন্তর স্বামীজী পুনরায় পূজায় বসিলেন। পূজান্তে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া হোম করিলেন এবং সন্ন্যাসী ভ্রাতৃগণের সহায়ে স্বহস্তে* পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। বোধ হয়, ঐ দিন ঐ স্থানে তিনি কয়েকটি গৃহস্থকে দীক্ষাপ্রদানও করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, পূজা সমাপন করিয়া স্বামীজী সাদরে সমাগত সকলকে আহ্বান ও সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা করুন যেন মহাযুগাবতার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করে ইহাকে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয়-কেন্দ্র করে রাখেন।' সকলেই করযোড়ে ঐরূপ প্রার্থনা করিলেন। পূজান্তে স্বামীজী শিষ্যকে ডাকিয়া

*স্বামী শিবানন্দ পায়েস রান্না করেছিলেন।

বলিলেন—‘ঠাকুরের এই কৌটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আমাদের (সন্ন্যাসীদের) কারও আর অধিকার নাই; কারণ আজ আমরা ঠাকুরকে এখানে বসিয়েছি। অতএব তুই-ই মাথায় করে ঠাকুরের এই কৌটা তুলে মঠে (নীলাম্বরবাবুর বাগানে) নিয়ে চল।’ শিষ্য কৌটা স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া বলিলেন—‘ভয় নাই, কর, আমার আজ্ঞা।’ শিষ্য তখন আনন্দিত চিত্তে স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া কৌটা মাথায় তুলিয়া লইল এবং শ্রীগুরুর আজ্ঞায় ঐ কৌটার স্পর্শাধিকার লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতে করিতে চলিল। অগ্রে কৌটামস্তকে শিষ্য, পশ্চাতে স্বামীজী, তারপর অন্যান্য সকলে আসিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে স্বামীজী তাহাকে বলিলেন—‘ঠাকুর আজ তোর মস্তকে উঠে তোকে আশীর্বাদ করছেন। সাবধান, আজ হতে আর কোনও অনিত্য বিষয়ে মন দিস নে।’ একটি ছোট সাঁকো পার হইবার পূর্বে স্বামীজী শিষ্যকে পুনরায় বলিলেন—‘দেখিস, এবার খুব সাবধান, খুব সতর্কে যাবি।’

‘‘এইরূপ নির্বিঘ্নে মঠে উপস্থিত হইয়া সকলেই আনন্দ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী শিষ্যকে এখন কথা-প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন—‘ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ তাঁর ধর্মক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হল। বারো বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নামল।’ ’’[৭৪]

এখানে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামীজীর জীবনীকাররা এই ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮-এর ঘটনার সঙ্গে ৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮-এর ঘটনা মিশিয়ে ফেলেছেন। ব্রহ্মচারী প্রকাশ ‘স্বামী সারদানন্দ’ গ্রন্থে লিখেছেন : ‘‘১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আরব্ধ হইয়া দ্রুত কার্য পরিচালনার ফলে নভেম্বরের শেষে নূতন মঠের বাটীঘর প্রভৃতি কার্য শেষ হইয়া যায়। ৯ ডিসেম্বর তথায় শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠা করা হইল এবং স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি গৃহপ্রবেশ করিলেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি নীলাম্বরের বাগানবাটী সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট সাধু ব্রহ্মচারী সকলে নূতন মঠে আসিলেন।’’[৭৫]

যাহোক, ১৮৯৮ সালের সাধারণ উৎসবের দিন সকালে শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনাটি সঙ্ঘটিত হয় এবং সারাদিন দাঁয়েদের ঠাকুর বাড়িতে বিরাট করে জন্মমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম করে উৎসবকে জাঁকিয়ে তুললেন।

এই উৎসবের বর্ণনা নিবেদিতা ১৬ মার্চ ১৮৯৮ ব্রহ্মবাদিন পত্রিকায় লেখেন। সেই প্রতিবেদনের সারাংশের বাংলা অনুবাদ :

‘‘এখানে এই রবিবার সকালে আকাশ সূর্যকিরণে ঝলমল করছিল। কাছে কোন মন্দিরের ঘণ্টা বেজে চলেছিল, শিবের মন্দিরটির ওপর ঝরে পড়ছিল বিশাল গাছটির শুকনো পাতা। বাতাস ছিল জাফরানের গন্ধে ভরপুর।... পূর্ণচন্দ্র দাঁর ঠাকুরবাড়ি ও উদ্যানের ঘাটে নামবার অনেক আগে থেকেই নৌকায় বসে হাজার হাজার মানুষের কোলাহল এবং কীর্তনাদির রব শুনতে পাচ্ছিলাম।... এত বেশি মানুষের ভিড় হয়েছিল যে, নদীর ঘাট থেকে আমাদের উদ্যানবাড়িটিতে পৌঁছাতে হিমসিম খেতে হয়েছিল।...

‘‘উপস্থিত সকল মানুষই আন্তরিকভাবে আগ্রহী। শত শত বাঙালী যুবক সাগ্রহে লক্ষ্য করছিল এবং স্বামীজীকে দেখতে পেয়েই তাঁর পিছু নিয়েছিল এবং চিৎকার করছিল ‘বক্তৃতা! বক্তৃতা’! উদ্যানের অপর এক অংশে সন্ন্যাসিগণ রাঁধুনি বামুনদের দিয়ে প্রস্তুত খিচুড়ি জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করছিলেন। শিশুসহ প্রায় কুড়ি হাজার লোককে সারাদিন ধরে খাওয়ানো হয়। এই বৃহৎ মহোৎসবে মানুষদের শান্তভাব ও শৃঙ্খলাবোধ দেখে বিস্মিত হতে হয়।... কিন্তু উদ্যানের প্রধান আকর্ষণ ছিল একটি সাময়িকভাবে তৈরি মন্দির, যার বেদির ওপর

শোভা পাচ্ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি। মন্দিরের থাম ও ধনুকাকৃতি খিলানগুলি ছিল গাঁদা ফুল দিয়ে ঢাকা। চন্দ্রাতপের কাজ করছিল জালের ন্যায় বোনা যুঁই কুঁড়ির মালার গুচ্ছ, তার মাঝে-সাজে ছিল গোলাপফুল।

''এই মহোৎসব একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সব বাঁধন ভেঙে উঁচু-নিচু, পুরুষ-নারী, আপন-পর সকলে মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল। গোপালের মার মতো স্বাভাবিক ভক্তি সবাইকে এখানে টেনে এনেছিল, সেই ভক্তির আলোকে সকলেই তীব্রভাবে অনুভব করছিল, সবার মধ্যে একত্ব।''[৭৬]

৬ মার্চ ১৮৯৮ স্বামী প্রেমানন্দ মাদ্রাজে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখেন :

''গত রবিবার দাঁ-দের বাগানে মহোৎসব আদি উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—প্রায় অন্য বৎসরের তুল্য। ঐদিন নূতন জায়গায় নরেন্দ্র নিজে ঠাকুর লইয়া গিয়া পূজা ও হোম করিয়াছিলেন। এবং পায়সান্ন ভোগ হইয়াছিল। গতকল্য ঐ জায়গাটি ৩৯০০০ হাজার টাকায় ক্রয় করা হইয়াছে। শ্বেতপাথরের মন্দির ও প্রকাণ্ড বাটী তৈয়ারের আয়োজন হইতেছে। শীঘ্রই কার্য্য আরম্ভ হইবে। দেখে শুনে লোকে অবাক হইয়াছে। তাঁর কার্য তিনিই করেন।''[৭৭]

স্বামী অম্বিকানন্দ স্মৃতিচারণ করেন :

''তখন বেলুড় মঠ তৈরি হয়নি। মঠ তখন নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে। ১৮৯৮ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বেলুড়ে দাঁ-দের ঠাকুরবাড়িতে ঠাকুরের জন্মোৎসব হলো। স্বামীজী দেখতে চললেন; সঙ্গে সাহেব-মেমরা। শামিয়ানা খাটানো আছে। বহু লোক। সকলে স্বামীজীকে অনুরোধ করল, ''স্বামীজী, আজ শুভদিনে আপনি এসেছেন। আমরা আপনার মুখ থেকে দুটো কথা শুনতে চাই।'' স্বামীজী রাজি হলেন। রোদ তাঁর গায়ে পড়ছে দেখে মেমরা রংবেরঙের ছাতা খুলে তাঁর মাথার ওপর ধরল। স্বামীজীর সেই অপূর্ব বলার ঢং ও তেজ দেখলাম। তিনি বাংলায় কিছুক্ষণ বলেছিলেন।''[৭৮]

ক্রমশ

তথ্যসূত্র

৬৫। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী, *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ*, পূর্বকাণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৭০, পৃঃ ১১৩-১৪

৬৬। সম্পাদনা : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *স্মৃতির আলোয় স্বামীজী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২, পৃঃ ২৬০-৬২

৬৭। *স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৮৬, পৃঃ ১৭১-৭২ এরপর, *স্বামী* [*প্রেমানন্দের পত্রাবলী*]

৬৮। শ্রীম-কথিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০৬, খণ্ড ২, পৃঃ ১১৪৫

৬৯। স্বামী অপূর্বানন্দ, *শিবানন্দ বাণী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬২, খণ্ড ১, পৃঃ ১৩৪

৭০। দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু*, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৩৭০, পৃঃ ১১৭

৭১। স্বামী চেতনানন্দ, *প্রাচীন সাধুদের কথা*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৯, খণ্ড ২, পৃঃ ১১৫ [এরপর, *প্রাচীন সাধুদের কথা*]

৭২। *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৬৯, খণ্ড ৮, পৃঃ ১৯

৭৩। তদেব, খণ্ড ৮, পৃঃ ২৬

৭৪। *স্বামি-শিষ্য-সংবাদ*, পূর্বকাণ্ড, পৃঃ ১১৫-১১৮

৭৫। ব্রহ্মচারী প্রকাশ, *স্বামী সারদানন্দ*, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯৩৬, পৃঃ ১২৫

৭৬। স্বামী প্রভানন্দ, *রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০৮, পৃঃ ২১৭-১৮

৭৭। *স্বামী প্রেমানন্দের পত্রাবলী*, পৃঃ ১৭২

৭৮। *প্রাচীন সাধুদের কথা*, খণ্ড ২, পৃঃ ১১৬

ভজনানন্দে ব্রজের রাখাল স্বামী ব্রহ্মানন্দ

স্বরাজ মজুমদার

ব্রজের রাখাল

শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দের লীলাময় দিব্যজীবন অনুধ্যান করে তাঁর লোকাতীত স্বরূপ বোঝার প্রয়াস মনে হয় কিছুটা সহজ ও সরল হয় যদি আমরা তাঁর স্বল্পালোচিত ভজনপিয়াসী জীবনের দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টিপাত করি। তাহলে তাঁর এবারকার মর্ত্যলীলার শুরু, মধ্য ও শেষ পর্বের ঘটনাবলির সামঞ্জস্য করা সম্ভব হয় এবং তাদের ভিতরকার অবিচ্ছিন্ন ভাব, সুর বা যোগসূত্রটিও আমরা ধরতে পারি। এই নিবন্ধের চেষ্টা সেইদিকেই।

নামটিও 'রাখাল'। রাখাল শুনলেই ভক্তমনে শ্রীকৃষ্ণের রাখালিয়া বাঁশির উদ্দীপন হয়; মানসপটে ভেসে ওঠে কৃষ্ণপ্রেমে পাগল, বৃন্দাবনের লীলাচঞ্চল গোপগোপীদের কাণ্ডকারখানা এবং অবশ্যই তাঁদের নাচগান ও আনন্দ-উল্লাসের কথা। বাস্তবিক, ব্রজভূমির সঙ্গে নাচগানের—সুর ও ছন্দের অতি নিবিড় সম্পর্ক। বহুবার বৃন্দাবনে থাকার সময় নিজেও তা দেখেছি। 'ভাগবত'-এর দশম স্কন্ধেও গোপীরা কীর্তিত হয়েছেন নৃত্যগীতপরায়ণা বলে। রাসলীলার সময় কৃষ্ণ-অঙ্গের দিব্যস্পর্শে আনন্দবিহ্বলা নৃত্যরতা এই ব্রজললনারা নানা রাগে ও তালে গান গেয়ে মদনমোহনকে তৃপ্ত করেন। কামগন্ধহীন এই রাসস্থলীতে সমবয়সি গোপ-বালকদের প্রবেশাধিকার না থাকলেও শ্রীকৃষ্ণের অভূতপূর্ব বাল্যলীলায় তারা কিন্তু নিত্য উপস্থিত। মাঝেমাঝেই সেখানে দেখি কৃষ্ণ-বলরাম সমবয়স্ক গোপবালকদের সঙ্গে নাচছেন, গাইছেন অথবা বংশীবাদন করছেন—''কৃষ্ণস্য নৃত্যতঃ কেচিজ্জগুঃ কেচিদবাদয়ন্।/ বেণুপাণিতলৈঃ শৃঙ্গৈঃ প্রশশংসু-রথাপরে॥" (শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।১৮।১০) আবার কৃষ্ণ নাচছেন দেখেও কেউ গান করছে; কেউ কেউ বাঁশি, করতাল ও শিঙা বাজাচ্ছে। কখনও বন্ধুরা নাচছে দেখে কৃষ্ণ-বলরাম গান করছেন, নয়তো বাজনা বাজাচ্ছেন। ''ক্বচিন্নৃত্যৎসু চান্যেষু গায়কৌ বাদকৌ স্বয়ম্। শশংসতুর্মহারাজ সাধু সাধ্বিতিবাদিনৌ॥" (তদেব, ১০।১৮।১৩)

'রাখাল' বা ভবিষ্যতের স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন এই নৃত্যগীতপটু কৃষ্ণসখাদেরই একজন

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখক, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার থেকে প্রকাশিত Bulletin-এর প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক

ব্রজকিশোর। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবার শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে নরদেহে আবির্ভূত হলে রাখালকেও তাঁর লীলাপুষ্টির জন্য আবির্ভূত হতে হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ''একদিন কীর্তন শুনতে শুনতে রাখালকে দেখেছিলাম ব্রজমণ্ডলের ভিতর রয়েছে।''[১] শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় এবার তিনি রাখালচন্দ্র ঘোষ। শিকড়া-কুলীন গ্রামের জমিদার আনন্দমোহনের পুত্ররূপে জন্ম নিলেও দক্ষিণেশ্বরে প্রাণসখার চরণপ্রান্তে এসে পড়তে তাঁর বিলম্ব হয়নি।

কাশীপুরে থাকার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ''যখন যেরূপ লোক আসবে, আগে দেখিয়ে দিত! এই চক্ষে—ভাবে নয়...। বটতলায় একটি ছেলে দেখেছিলাম। হৃদে বললে, তবে তোমার একটি ছেলে হবে।' আমি বললাম, 'আমার যে মাতৃযোনি! আমার ছেলে কেমন করে হবে?' ''[২] এই সংশয়ের নিরসন করে দেন জগন্মাতা স্বয়ং। রাখাল আসার দিন কয়েক আগে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখছেন মা সহসা একটি বালককে তাঁর কোলে বসিয়ে দিয়ে বলছেন, ''এইটি তোমার পুত্র।'' আতঙ্কে শিউরে উঠে তিনি বললেন, ''সে কি?— আমার আবার ছেলে?'' মা হেসে বুঝিয়ে দিলেন, না না; ''সাধারণ সংসারিভাবে ছেলে নয়, ত্যাগী মানসপুত্র।''[৩]

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত মনোমোহন মিত্রের বোন বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে রাখালের বিয়ে হয় এবং তার কয়েকদিন পরই মনোমোহন রাখালকে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে আসেন। রাখাল দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছনোর দিনই ঠাকুর ভাবচক্ষে দেখেন—''গঙ্গাবক্ষে সহসা শতদল পদ্ম বিকশিত হইয়াছে; তাহার দলে দলে অপূর্ব শোভা; চিরকিশোর রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণের করধারণ করিয়া অপর একটি অনুরূপ বালক নূপুরপায়ে শতদলের উপর নৃত্য করিতেছে; নৃত্যের অপূর্ব ছন্দে মাধুর্যসিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মহারা হইলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন রাখালচন্দ্র।''[৪] ঠাকুর অবাক! এই তো সেই বটতলার ছেলে! একেই জগদম্বা তাঁর কোলে বসিয়ে দিয়েছিলেন! এই তো সেই কমলদলে নৃত্যরত কৃষ্ণসখা ব্রজকিশোর! শিষ্টাচারবশত তবুও শ্রীরামকৃষ্ণ বালককে জিজ্ঞাসা করলেন, ''তোমার নামটি কি?'' বালকের উত্তর, ''শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ।'' 'রাখাল' নামটি শুনেই ঠাকুরের ভাবান্তর। গদগদকণ্ঠে বলে ওঠেন—''সেই নাম! রাখাল—ব্রজের রাখাল!''[৫]

অবতারদের পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি ও আধ্যাত্মিক দিব্যজ্ঞান অনাবৃত বা অলুপ্ত থাকে। সাময়িক বিস্মৃত হলেও ইচ্ছামাত্র তাঁরা সেই স্মৃতি জাগ্রত করতে পারেন। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো অর্জুনকে স্পষ্টভাবে এই কথাই বলেছিলেন, ''বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।/ তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥'' (৪।৫১) অর্থাৎ—''হে অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম হয়েছে; আমি সেসব কথা জানি, কিন্তু তুমি তা জান না।''

এ থেকে দুটি সত্য আরও একবার প্রমাণিত হয়। এক, ''যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং এই দেহে রামকৃষ্ণ''—যে-কথা ঠাকুর স্বামীজী ও তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের একাধিকবার বলেছেন। বৃন্দাবনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও রাখালের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আরও কয়েকটি প্রমাণ আছে। যেমন, দক্ষিণেশ্বরে কাপ্তেনের সঙ্গে গোপীদের প্রসঙ্গ করতে গিয়ে ঠাকুর একটি গুহ্যকথা বলেছিলেন, ''গোপীদের কাছে খাওয়া, খেলা, কাঁদা, আবদার করা, এ-সব হয়েছে।''[৬] আর রাখাল প্রসঙ্গে বলা যায়, তাঁর প্রথম ভাবাবেশ হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে 'ভাগবত' পাঠ শুনে এবং দ্বিতীয়বার বলরাম বসুর বাড়িতে ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। সেদিন ছিল দোল। দোল উৎসবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা তথা গোপগোপীদের নিবিড় সম্পর্কের কথা কোনও

ভক্তেরই অজানা নয়। আর 'ভাগবত' তো কৃষ্ণলীলার রসে আদ্যন্ত সম্পৃক্ত। অতএব ব্রজবালকের ভাব তো হবেই।

আর একটি প্রমাণের উল্লেখ করা যায়। রাখালের শরীর তখন ভাল যাচ্ছিল না; মাঝে মাঝেই জ্বর হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত। কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন জলবায়ু পরিবর্তন প্রয়োজন। যোগাযোগও হয়ে গেল। বলরামবাবু তখন সপরিবারে বৃন্দাবনধামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি রাখালকে নিয়ে যেতে চাইলে ১৮৮৪-র আগস্ট মাসে রাখাল বৃন্দাবনে যান। সেখানকার নৈসর্গিক পরিবেশ ও আধ্যাত্মিক বাতাবরণ দেখে তিনি অভিভূত! কলকাতায় মাস্টারমশাইকে (শ্রীমকে) চিঠি লিখলেন : ''এ বড় উত্তম স্থান, আপনি আসবেন, —ময়ূর-ময়ূরী সব নৃত্য করছে—আর নৃত্যগীত, সর্বদাই আনন্দ!''[৭] এই নৃত্যগীত কথাটি বর্তমান প্রসঙ্গে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। যাই হোক, এই নৃত্যগীত ও জন্মান্তরের পরিচিত পরিবেশের জমাটি আনন্দের সংস্পর্শে তাঁর মন দিবারাত্র দিব্যভাবে উল্লসিত থাকলেও দেহ আবার আক্রান্ত হল। সে-খবর ঠাকুরের কানে পৌঁছলে তিনিও বিশেষ চিন্তিত হন এই কারণে, যেখান থেকে এসে যে শরীর ধারণ করে সেখানে গেলে প্রায়শ পূর্বকথা মনে স্ফুরিত হয়ে সেখানেই তার শরীর যায়। ঠাকুর জানতেন রাখাল ব্রজের রাখাল। তাই তাঁর ভয় হয়েছিল। তিনি মায়ের কাছে কাতর প্রার্থনা করেন, ''তার জন্য চণ্ডীকে মানলুম। সে যে আমার উপর সব নির্ভর করেছিল—বাড়িঘর সব ছেড়ে!''[৮] মা অবশ্য তাঁকে অভয় দিয়ে বলেন—ভয় নেই, ও সেরে উঠবে। যাই হোক, মানসপুত্রের প্রতি বাৎসল্যরসে আপ্লুত হয়ে রহস্য করে ঠাকুর ভক্তদের কাছে একথা বলতেও ছাড়লেন না—''বৃন্দাবন থেকে এঁকে [মাস্টারমশাইকে] লিখেছে, এ বেশ জায়গা—ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করছে—এখন ময়ূর-ময়ূরী বড়ই মুশকিলে ফেলেছে!''[৯]

শ্রীরামকৃষ্ণ সংশয়াতীতভাবে জানতেন, নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি রাখালের সঙ্গে তাঁর জন্মান্তরের নিত্যসম্বন্ধ। 'কথামৃতে' তাই দেখি, একদিন (৮ জুন ১৮৮৩) ভাবে রাখালকে সম্বোধন করে ঠাকুর বলছেন, ''আমি অনেকদিন এখানে এসেছি!—তুই কবে এলি?'' ভারি তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত! শ্রীশ্রীমা সারদাও তাই বলতেন, ''যে যার সে তার; যুগে যুগে অবতার।'' তবে শ্রীরামকৃষ্ণ বরাবরই খুব সতর্ক ছিলেন যাতে তাঁর আদরের রাখাল ব্রজের পরিচয় কোনওভাবেই জানতে না পারেন, জানলে হয়তো তিনি দেহ ছেড়ে দেবেন। এ-ব্যাপারে তিনি তাঁর কোনও কোনও অন্তরঙ্গ পার্ষদকেও বিশেষভাবে সাবধান করে দেন এবং বলেন, ''তাহার [রাখাল সম্বন্ধে] অনেক কথা বলিতে নিষেধ আছে।''[১০] তা সত্ত্বেও এই আলোচনার একেবারে অন্তিমপর্বে আমরা দেখব একটি সংগীতের সূত্র ধরেই কেমন করে ভজনপ্রিয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাঁর স্বরূপস্মৃতি ফিরে পান এবং তার কিছুকালের মধ্যেই লীলাসংবরণ করেন।

ভজনানন্দে ব্রহ্মানন্দ

ব্রজভূমির সহজাত সংস্কার নিয়ে জন্মেছিলেন বলেই বোধকরি ভজন-কীর্তন ও নৃত্যগীতের প্রতি রাখালচন্দ্রের তীব্র অনুরাগ ছিল! ভজন ঈশ্বরের নামগুণকীর্তন। যেহেতু এটি সাধনার অঙ্গ তাই দুটি শব্দকে জুড়ে বলি সাধন-ভজন। এই নামগুণ-কীর্তনকে শ্রীরামকৃষ্ণ 'অনুরাগের ঐশ্বর্য' বলেছেন। বলেছেন, ''সর্বদাই তাঁর নামগুণগান-কীর্তন, প্রার্থনা করতে হয়।''[১১] অধ্যাত্মজগতের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, এমনকী অদ্বৈতপন্থী দিকপালরাও তাই স্বভাবত ভজনপ্রিয়। তুলসীদাস, সুরদাস, মীরাবাঈ, নামদেব, তুকারাম, নানক, কবীর থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার সম্প্রদায়, বাংলার রামপ্রসাদ,

কমলাকান্ত—কে নন? অদ্বৈতবাদী আচার্য শংকরও গেয়েছেন : ''ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং গোবিন্দং ভজ মূঢ়মতে'' অথবা ''জয় জগদীশ হরে'' ইত্যাদি। আর শ্রীরামকৃষ্ণ? তিনি তো গানে ভাসতেন। ভজনে সহজে মনে উদ্দীপনা আসে, ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা আসে। যার মন সূক্ষ্ম ও একাগ্র, তার সেই ঈশ্বরতন্ময়তা গাঢ়তর হয়। একদিন (১৮৮৩, ১৯ আগস্ট) দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর নরেন্দ্রকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করলে নরেন্দ্র গাইলেন, ''সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে।/ (সেদিন কবে বা হবে) নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপসাগরে॥'' গান শুনতে শুনতে ঠাকুর সমাধিস্থ, তা দেখে নরেন্দ্র পুবদিকের বারান্দায় গিয়ে হাজরা মশায়ের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কারণ গান আর কাকে শোনাবেন? কিছুক্ষণ পর বাহ্যজ্ঞান ফিরলে ঠাকুর এদিক-ওদিক চাইছেন, দেখছেন নরেন্দ্র আছে কী না। নরেন্দ্র তো নেই! তখন বলছেন, ''আগুন জ্বেলে গেছে, এখন থাকল আর গেল!''[১২] বাস্তবিক ভজন-কীর্তন হল এই আগুন জ্বালা।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দশম সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দ একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন : ''শ্রীরামকৃষ্ণকে যদি বলা হয় 'লাইব্রেরী এডিশন্', তবে রাজা মহারাজ ছিলেন যেন তাঁরই 'পকেট এডিশন্'[১৩] অর্থাৎ মানসপুত্র হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সব ভাব, সব ঐশ্বর্য আয়ত্ত করে পরিণত অবস্থায় তিনি যেন ঠাকুরের ছোটখাট প্রতিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। এমনকী অনেক সময় পিছন থেকে দেখলে গুরুভাইদেরও তাঁকে ঠাকুর বলে ভুল হত। হবে নাই বা কেন? ১৮৮৩-র ২ জুন বলরাম বসুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলেননি—''মা, তোমাকে বলেছিলাম, একজনকে সঙ্গী করে দাও আমার মতো। তাই বুঝি রাখালকে দিয়েছ?''[১৪] যাই হোক, তাঁর পরিণত জীবনের কথা ছেড়ে এখন আমরা তাঁর বাল্য অবস্থাটি একবার দেখব, কারণ 'Morning shows the day'।

বাল্যজীবন

শৈশবেই রাখালচন্দ্রের জীবনে ভক্তিভাবের প্রকাশ দেখা যায়, দেখা যায় বিভিন্ন দেবদেবীতে তাঁর সহজাত বিশ্বাস। ভক্তিবিশ্বাসের প্রেরণাতেই কালীমূর্তি গড়ে সঙ্গীসাথিদের নিয়ে তিনি পূজা-পূজা খেলতেন। এ-গুণটি শ্রীরামকৃষ্ণেরও ছিল। যাই হোক, সুর ছাড়া কি ভাবুক ভক্তমনের পূজা করে তৃপ্তি হয়? একটু গানও চাই। কারণ তাতে আত্মনিবেদন নিবিড়তর হয়। তাই বালক রাখালকে দেখা যেত গানের সুরে সহজেই আকৃষ্ট, আবিষ্ট হতেন। বৈষ্ণব ভিখারির কণ্ঠে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গান শুনে অনায়াসে তা শিখে নিতেন এবং বাড়ির সংলগ্ন বোধনতলায় ছোট ভাইবোনেদের নিয়ে গিয়ে হরিনাম কীর্তন করতেন, তালিমও দিতেন। শেখাতেন কীভাবে হাততালি দিয়ে কীর্তন করতে হয়। তাঁকে ঘিরে তারা গাইত—''জয় রাধে রাধে গোবিন্দ জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র।'' গানে তিনিও যোগ দিতেন এবং কখনও কখনও শুনতে শুনতে স্থির হয়ে চোখ বুজে বসে থাকতেন। শাক্ত গায়কদের গান শুনে বেশ কিছু রামপ্রসাদী শ্যামাসংগীতও এই সময় তিনি আয়ত্ত করেছিলেন এবং বাড়ির মাইল খানেক দূরে পীরের দরগায় ''সঙ্গীদের... সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে শ্যামাসঙ্গীত গাইতে গাইতে তন্ময় হয়ে যেতেন।''[১৫] এ থেকেই অক্ষয়চৈতন্যের অনুমান, শ্যাম ও শ্যামা উভয়েই রাখালচন্দ্রের ইষ্ট দেব-দেবী ছিলেন। সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবী মানসপুত্রের মধ্যে পিতার উদার ভাব অতি শৈশবেই স্ফুরিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে একদিন স্বামী মুক্তেশ্বরানন্দ (ঈশ্বর মহারাজ) চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে

তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন : ''উনি তো আগে শাক্ত ছিলেন—দেবীপূজা করতেন, পরে বৈষ্ণব হয়ে যান?'' মহারাজ উত্তর দেন, ''উনি মহাপুরুষ ছিলেন, তা দেবী আর কৃষ্ণ কি আলাদা?''[১৬] প্রসঙ্গত, মহারাজ চণ্ডীদাসের অনেক পদ জানতেন। জানতেন কিছু ব্রহ্মসংগীত। যৌবনে ও পরবর্তী কালেও তিনি সাগ্রহে সেগুলি শুনতেন।

স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত ছোটবেলা থেকেই রাখালচন্দ্রকে দেখেছিলেন; বিশেষত সেই সময় যখন তিনি দত্তবাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতেন। তা সত্ত্বেও মহেন্দ্রনাথ মহারাজের সংগীতপ্রিয়তার কথা বলতে গিয়ে যে-মন্তব্য করেছেন তা যথার্থ নয়। তিনি লিখেছেন, ''বরানগর মঠে যুবা রাখাল অবসর মত, সামান্য ভাবে অর্থাৎ কাজ চালান মত একটু বাঁয়া তবলা বাজাইতে শিখিয়াছিল। সঙ্গীতের প্রতি তাহার যে একটা ভালবাসা ছিল ইহাই তাহার নিদর্শন। সে নিজে কখনও গান করে নাই, কিন্তু সে ভজনগান অতি আগ্রহের সহিত শুনিত।''[১৭]

স্বামী ব্রহ্মানন্দের জীবন ও চরিত্র যতটুকু অনুধাবন করেছি এবং প্রত্যক্ষদর্শী সাধুদের স্মৃতিকথা থেকে যতটুকু জেনেছি তাতে আমার সিদ্ধান্ত, মহেন্দ্রবাবুর মত সর্বাংশে ঠিক নয়। হতে পারে স্বকর্ণে তিনি যুবক রাখালচন্দ্রকে কখনও গাইতে শোনেননি—তাই একথা লিখেছেন। কিন্তু আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানি মহারাজের ভজনপ্রিয়তা শ্রবণেই সীমাবদ্ধ ছিল না। শৈশবে তাঁর গানের উল্লেখ আগেই করেছি। পরবর্তী কালেও কখনও কখনও তাঁকে ভজন করতে শোনা গেছে। ভাবরাজ্যের রাজা নিত্যসিদ্ধ মহারাজ ভাব চাপায় সিদ্ধ হলেও ভক্তিভাবের সহজাত প্রেরণায় কখনও কখনও গান গেয়ে উঠতেন—কাউকে শোনানোর জন্য নয়—অনুচ্ছ্বসিত মধুর স্বরে তা ছিল যেন অস্ফুট স্বগতোক্তির মতো, কখনও অন্য কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে, কখনও একাই আনমনে।

ক্রমশ

তথ্যসূত্র

১। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১, অখণ্ড, পৃঃ ৩১৮ [এরপর, *কথামৃত*]

২। তদেব, পৃঃ ১০১৩

৩। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১, ভাগ ১, পৃঃ ৯৩ [এরপর, *ভক্তমালিকা*]

৪। তদেব, পৃঃ ৯৬-৯৭

৫। তদেব, পৃঃ ৯৭

৬। *কথামৃত*, পৃঃ ৮৪৭

৭। তদেব, পৃঃ ৫৪৮

৮। তদেব, পৃঃ ৫৪৮-৪৯

৯। তদেব, পৃঃ ৫৪৯

১০। *ভক্তমালিকা*, ভাগ ১, পৃঃ ১১০

১১। *কথামৃত*, পৃঃ ১৭৯

১২। তদেব, পৃঃ ২৫২-৫৩

১৩। দ্রঃ Compiled and edited by Swami Atmashraddhananda, *Swami Brahmananda As We Saw Him*, Sri Ramakrishna Math, Chennai, 2010, p. 120

১৪। *কথামৃত*, পৃঃ ১৯১

১৫। দ্রঃ ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, *ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা*, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৩৯৫, পৃঃ ২

১৬। তদেব, পৃঃ ৬৬

১৭। মহেন্দ্রনাথ দত্ত, *অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুধ্যান*, দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, মহেন্দ্র প্রজ্ঞাপীঠ, কলকাতা, ২০০৬, পৃঃ ৩২-৩৩

শ্রীশ্রীমা প্রসঙ্গে গোলাপ-মার অপ্রকাশিত স্মৃতি

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[২০ ডিসেম্বর ১৯১৬ তারিখের এই স্মৃতিকথাটি সংগৃহীত হয়েছে ব্রহ্মচারী গণেন মহারাজের ডায়েরি থেকে। ডায়েরিটি দেখার সুযোগ লেখকের হয়েছে শ্যামলকুমার গাঙ্গুলি মহাশয়ের সৌজন্যে। তিনি দেবেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির পুত্র, যিনি শ্রীশ্রীমায়ের সময়ে মায়ের বাড়িতে আশ্রিত থেকে পড়াশোনা করতেন।]

গণেন—গোলাপ-মা, আপনি তো মায়ের সঙ্গে সব তীর্থদর্শনে গিয়েছিলেন। কোথায় থাকতেন আপনারা?

গোলাপ মা—অত কি সব মনে আছে?

গণেন—প্রথমবার বৃন্দাবনে যে একবছর কাটালেন, তখনও তো অন্যান্য তীর্থদর্শনে বেরিয়েছিলেন। আমরা যতদূর শুনেছি, আপনারা কাশী, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, হরিদ্বার, জয়পুর ও পুষ্কর গিয়েছিলেন।

গোলাপ-মা—ফেরার পথে প্রয়াগেও গিয়েছিলাম।

গণেন—একটুও মনে পড়ে না, কোথায় ছিলেন?

গোলাপ-মা—কাশীতে মায়ের সঙ্গে তিনবার গেছি। শেষবার দত্তদের নতুন বাড়িতে ছিলাম। প্রথমবার কেদারঘাটের কাছে বটুক দত্ত নামে এক বাঙালির বাড়িতে ছিলাম। তিনি কাশীযাত্রীদের বাড়ি ভাড়া দিতেন। দ্বিতীয়বার, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মন্দিরের কাছে যে ঘাটটা আছে—কী যেন নাম?

গণেন—শিবগঙ্গা ঘাট।

গোলাপ-মা—সেই ঘাটের কাছে একটা ধর্মশালায়।

গণেন—অযোধ্যায় কোথায় ছিলেন?

গোলাপ-মা—ওখানে পাণ্ডারা তীর্থযাত্রীদের থাকার জন্য ঘর করে রেখেছে। সেখানে রান্নারও সব ব্যবস্থা থাকে। মনে পড়ছে বিহারী পাণ্ডে ছিল পাণ্ডার নাম। তার বাড়িতে ছিলাম।

গণেন—এইসব তীর্থে কতদিন করে থাকতেন?

গোলাপ-মা—মা প্রতি তীর্থেই কম করে ত্রিরাত্রি বাস তো করতেনই। কোথাও বা আরও বেশি।

গণেন—হরিদ্বারে কোথায় ছিলেন?

গোলাপ-মা—হরিদ্বারে বিষ্ণুঘাটের কাছে এক মাড়োয়ারির ধর্মশালায়। সে-মাড়োয়ারির বাড়ি কলকাতায়। ওটা ব্যবসার জন্য করেছে। সে

প্রখ্যাত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষক

যোগীনের চেনাশোনা ছিল।

গণেন—জয়পুরে কোথায় ছিলেন?

গোলাপ-মা—বাড়িওলার নাম মনে নেই। ওখানে বাঙালিটোলা বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে এক মাড়োয়ারি ধর্মশালায় ছিলাম।

গণেন—পুষ্করেও তো আপনারা গিয়েছিলেন?

গোলাপ-মা—পুষ্করে মা সাবিত্রী পাহাড়ে উঠেছিলেন। পুষ্কর সরোবরে স্নান করে ওখানে সাবিত্রী দেবীর পুজোও করেছিলেন মা। ওখানেরই এক ধর্মশালায় থাকা হয়েছিল।

গণেন—ওইসব তীর্থ সেরে আপনারা তো আবার বৃন্দাবনে এসেছিলেন?

গোলাপ-মা—হ্যাঁ। আবার ফিরে বৃন্দাবনে—কয়েকদিন বাস করে প্রয়াগ যাই।

গণেন—প্রয়াগে কোথায় ছিলেন?

গোলাপ-মা—কী যেন নাম ছিল স্টেশনটার?

গণেন—এলাহাবাদ।

গোলাপ-মা—আমাদের স্টেশনে পৌঁছতে রাত হয়ে গিয়েছিল। ওখানকার কোর্টে কাজ করত যোগীনের দক্ষিণেশ্বরের এক বন্ধু। যোগীন আমাদের স্টেশনে বসিয়ে রেখে বন্ধুর বাড়ি সন্ধান করে বের করেছিল। সেখানেই ছিলাম আমরা। দ্বিতীয়বার যখন মা তাঁর মা-ভাইদের নিয়ে প্রয়াগ গিয়েছিলেন সেবার আমরা প্রয়াগ সঙ্গমের কাছাকাছি একটা ধর্মশালায় ছিলাম।

গণেন—আচ্ছা, মা যে ওসব জায়গায় যেতেন, সেখানকার লোকে কিছু বুঝত না?

গোলাপ-মা—তা আবার নয়! ঠাকুরের কী লীলামাহাত্ম্য তা তো কথায় বলার নয়। মা যেখানে যেতেন কাতারে কাতারে লোক এসে হাজির হত। এসে বলত—'মায়ীজী কা প্রণাম করনে আয়া হ্যায়।'

গণেন—কোথাও বিশেষ কিছু ঘটত না?

গোলাপ-মা—সব জায়গাতেই ঘটত। মায়ের কৃপার কথা তো বলে শেষ করা যাবে না। মাঠে ঘাটে পথে এমনকী তীর্থে বেরিয়েও মা অকাতরে কৃপা বিলিয়ে যাচ্ছেন।

গণেন—যা মনে আছে এমন কিছু বলুন।

গোলাপ-মা—রামের মায়ের একবার বড় অসুখ হয়। রোগ আর সারে না। ডাক্তাররা রামকে বলল, মাকে হাওয়া বদলের জন্য কোথাও পাঠিয়ে দাও কিছুদিনের জন্য। প্রথমে ঠিক হয়েছিল হাজারিবাগ। পরে ঠিক হল কৈলোয়ার। রামের পরিচিত কলকাতা হাইকোর্টের এক উকিল ছিল যার বাড়ি সেখানে—তারাও জমিদার। তাদের ফলফুলের বাগানবাড়িতেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। জায়গাটা নদীর ধারে আর নির্জন। রামের মা তখন নিরিবিলি জায়গায় থাকতে চেয়েছিল। মাসখানেক থাকার পর একটা ঘটনা ঘটল।

গণেন—কারও অসুখ-বিসুখ করেছিল?

গোলাপ-মা—অসুখ-বিসুখ কিছু নয়। মানুষের ভিড়। মাকে তো তারা তিষ্ঠোতে দেয়নি।

গণেন—কী ব্যাপার ঘটেছিল? তখন তো মায়ের অত প্রচার হয়নি।

গোলাপ-মা—না হলে কী হবে? ঠাকুরের লীলা তো মিথ্যা হওয়ার নয়। আমরা সেখানে যাওয়ার মাসখানেক পরে দেখি এক বুড়ি একটা রুগ্ন বাচ্চাকে আর তার মাকে সঙ্গে নিয়ে সাতসকালে আমাদের বাসার কাছে এসে হাজির। 'মায়ীজী, মায়ীজী' বলে ডাকছে। তার ডাক শুনে আমি বাইরে এলুম। জিজ্ঞাসা করলুম—কী ব্যাপার?

সে বলে—মা, আমার দুটি নাতি জন্মের পরই মারা গেছে। এটি বউমার তৃতীয় সন্তান। বছর দুই মাত্র বয়স। জন্ম থেকেই ভুগছে। অনেক ঠাকুর দেবতার কাছে ওর জন্য মানত করেছি। কিছু ফল হয়নি। কালরাত্রে স্বপ্নে দেখলুম কোলেশ্বরী মা (কৈলোয়ারের দেবী) বলছেন—জমিদারদের বাগানবাড়িতে যে মায়ীজী এসেছেন তাঁর কাছে যা, তাঁর কৃপা পেলে তোর নাতি বেঁচে যাবে। তাই মা,

বউ আর নাতিকে সঙ্গে নিয়ে মায়ীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—যদি তিনি কৃপা করেন।

এই কথা বলে বুড়ি, 'মাগো, বড় অভাগা আমি' বলেই হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। বড় বিপদে পড়েছিলুম। ভিতরে গিয়ে মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাইরে নিয়ে এলুম! মাকে দেখে শাশুড়ি-বউয়ের কান্না আরও বেড়ে গেল। মা বললেন—থামো, বাছা! মাকে তো সব ঘটনা জানিয়েই বাইরে এনেছিলুম। তারপর মা ঘরে ঢুকে ঠাকুরের কাছ থেকে তাঁর পুজো করা কিছু ফুল নিয়ে এসে বুড়ির হাতে দিয়ে বললেন—মা, তোমার রুগ্ন নাতির সারা শরীরে ঠাকুরের পুষ্প ছুঁইয়ে ঠাকুরের কাছে ওর আরোগ্যের জন্য প্রার্থনা জানাবে।

গণেন—তারপর তারা চলে গেল?

গোলাপ-মা—হ্যাঁ। বলেছিল পাশের গাঁয়ে চামারপাড়ায় বাড়ি। সপ্তাহখানেক পর আবার শাশুড়ি-বউ বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছিল। আমি বাইরে যেতেই বুড়ি বলল—মায়ীজীর কৃপায় নাতির জ্বর ছেড়ে গেছে। এখন ভাল আছে। সেই কথাটাই মায়ীজীকে জানাতে আর তাঁর চরণে দণ্ডবত দিতে এলাম। মাকে বাইরে নিয়ে এলে তারা মাকে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানাল। মা হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন—ঠাকুরকে স্মরণ কোরো।

গণেন—তারা 'ঠাকুর' কথাটা বুঝতে পারল?

গোলাপ-মা—আমারও তখন মনে হয়েছিল ওরা ঠাকুর বলতে ওদের জানা দেবদেবীর কথাই বুঝেছে। সেই কারণে আমি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে আমার কাছে ঠাকুরের একটা ছবি ছিল সেটি দেখিয়ে বললাম—এঁকে চেনো? এঁর নাম পরমহংস রামকৃষ্ণদেব। এঁকেই আমরা ঠাকুর বলি। এঁর ছবি জোগাড় করে রোজ দুবেলা প্রণাম জানাবে। এঁর কাছে মনের দুঃখ জানাবে। তারা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিল।

গণেন—তাদের সঙ্গে যখন কথা কইছিলেন তারা কি আপনার বাংলা কথা বুঝতে পারছিল?

গোলাপ-মা—আমি কোনওরকমে বাংলা আধা হিন্দি করে তো তাদের বলেছিলুম। মনে হয় বুঝতে পেরেছিল। আমি তাদের কথা বুঝতে পেরেছিলুম। আমার শ্বশুরবাড়িতে বিহারি চাকর ভজহরি থাকত। ভাল হিন্দি বলতে না পারলেও বুঝতে পারি।

গণেন—ওখানে এই একবারই যা ঘটেছিল?

গোলাপ-মা—না, না। তারপর দেখি ভিন্ন গাঁ থেকে মেয়েমদ্দ, ছেলেপিলে সব এসে বাগানের গেটের বাইরে জমায়েত হত। জিজ্ঞাসা করলে বলত মায়ীজীর দর্শন করতে এসেছে। তারপর মাকে ডেকে নিয়ে আসি। মা বাইরে এসে দাঁড়ালে—তারা বাইরে থেকে প্রণাম জানাত। মা হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করতেন। তবে আমাদের ভাগ্য ভাল যে, ফেরার দিন দশেক আগে থেকে এমন ঘটনা ঘটতে শুরু করেছিল। বেশিদিন ঝামেলা সইতে হয়নি।

গণেন—গোলাপ-মা, মায়ের সঙ্গে আপনাকেও বারবার প্রণাম জানাই। আপনার স্মরণশক্তি দেখে আমি মুগ্ধ।

গোলাপ-মা—কী যে বল! সবই ঠাকুরের কৃপা, তাঁর আশীর্বাদ।

গণেন—গয়ায় কি আপনি মায়ের সঙ্গে যাননি?

গোলাপ-মা—মা দুবার গয়ায় গিয়েছিলেন। প্রথমবার তিনি একা আর দ্বিতীয়বার মা-ভাইদের নিয়ে যান। দুবারই আমি মায়ের সঙ্গে ছিলাম।

গণেন—সেখানে মা কতদিন ছিলেন?

গোলাপ-মা—সব তীর্থেই মা কম করে ত্রিরাত্রি কাটিয়ে তবে অন্য কোথাও পা বাড়াতেন।

গণেন—গয়ায় কোথায় ছিলেন আপনারা?

গোলাপ-মা—পাণ্ডাদের অতিথিশালায়। দুবার দু-জায়গায় থাকা হয়েছিল। তাদের নিয়ম আছে, খোঁজ নেয় যাত্রীরা কোথা থেকে আসছে। তাদের খাতায় লেখা আছে কোন জেলার পাণ্ডা কে। সেই ভাবেই তারা সব লোকেদের কাজ করায়। ✠

ষোড়শীপূজা

অভিষেক উজান

যখন নারী অবহেলার পাত্রী বা আর পাঁচটা সাধারণ ভোগ্য বস্তুর মতোই মূল্যহীন ও তুচ্ছ, তখন নারীর নবপরিচয় নিয়ে, নবরূপ ধরে সর্বগ্রাসী মাতৃসত্তায় জগতকে আপন করে নিতে 'শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেমসুরধুনী' শ্রীমা সারদা দেবীর আবির্ভাব। সেই আবির্ভাবকেই সুস্বাগত জানিয়ে ষোড়শীপূজার মাধ্যমে জগতের চালচিত্রে তাঁর বোধন করলেন স্বয়ং যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ।

নারীমাত্রই আদ্যাশক্তির প্রকাশ, আর নারীর লৌকিক প্রকাশ কন্যা, জায়া ও মাতৃরূপে। মাতৃভাবই শুদ্ধতম ও সর্বাপেক্ষা কল্যাণপ্রদ ভাব। শ্রীশ্রীমায়ের এবারে আগমন যে সেই ভাবেরই প্রকাশের জন্য, তা তাঁর মুখেই শোনা যায়— ''ঠাকুরের [শ্রীরামকৃষ্ণের] জগতের প্রত্যেকের উপর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।'' একথার প্রমাণ তাঁর জীবন।

ভগবান বুদ্ধ, শংকর, চৈতন্যদেবের ধর্মজীবনে নারী এক প্রহেলিকা। শংকরাচার্য বলেছেন, ''নারী নরকের দ্বার।'' তুলসীদাসের দোঁহায় ''নারী দিনকো মোহিনী, রাতকো বাঘিনী।'' কিন্তু অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনবীণায় ঝংকৃত হয়েছে নারীর নবপরিচয়—'ব্রহ্মময়ীস্বরূপা'।

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুন অমানিশায় ঘটেছিল সেই অভূতপূর্ব ঘটনা—দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'ষোড়শীপূজা'। ঘটে-পটে বা শ্রীযন্ত্রে নয়; জীবন্ত মানুষে। তিনি তাঁর ধর্মপত্নীকে পূজার আসনে বসিয়ে পূজা করলেন। ''মাটির প্রতিমায় তাঁর পূজা হয়—আর মানুষে হয় না?'' অতএব এই পূজা বাস্তবতার আঙ্গিকে খুবই প্রাসঙ্গিক। শ্রীশ্রীমাকে যদি মানবীরূপে দেখি, তাহলে এ-পূজা যেন যুগাবতার কর্তৃক প্রদত্ত 'মাতৃভাব প্রচারের চাপরাশ'। আর যদি দেবীরূপে দেখি, তাহলে এ-পূজা জগৎসমক্ষে সাধারণের কাছে শ্রীশ্রীমা সম্পর্কে এক অভিজ্ঞানপত্র।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর যথাযোগ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা, নারীকে তার আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করা ছিল এই পূজার সামাজিক ফল, যা হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। আজ একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বলা যেতে পারে, এই প্রয়াস

স্বাস্থ্যকর্মী ও আবৃত্তিকার

জগৎকল্যাণে নারীশক্তির জাগরণের শুভসূচনা। তাই পূজার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে অভিসিঞ্চনান্তে শক্তির আবাহন করে বলেছিলেন, ''হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর; ইঁহার (শ্রীমায়ের) শরীর মনকে পবিত্র করিয়া ইঁহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর।''

আমরা জানি শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে সুকঠোর তপস্যা করেছেন সুদীর্ঘ বারো বছর। স্বয়ং জগৎকারণ ঈশ্বরের এই তপস্যা লোককল্যাণেই। তাহলে বলা যায়, যেদিন তাঁর তপস্যার সমাপ্তি ঘটল সেদিনই তাঁর উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে গেল। কিন্তু না, এ কোনও ইন্দ্রজাল নয়। যেহেতু অবতার-পুরুষদের সকল কর্মই সাধারণের মতো, তাই তার ফলাফলও সময়সাপেক্ষ, বস্তুত তাঁর এই সাধনলব্ধ সম্পদভাণ্ডারের চাবিকাঠি রইল সেই 'কুটোবাঁধা' মেয়েটির হাতে। যা উত্তরকালে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠবে সমগ্র জগতের কল্যাণে, যখন এই 'কুটোবাঁধা' মেয়েটির উত্তরণ হবে 'সঙ্ঘজননী' পদে। প্রশ্ন উঠতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই কেন জগৎকল্যাণে সেই শক্তি প্রয়োগ করলেন না? কেন শ্রীশ্রীমায়ের সাহায্যের প্রয়োজন হল? এর উত্তর পাই কথামৃতের পাতায়—''পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। শিবকালীর মূর্তি, শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন, কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। এই সমস্তই পুরুষ-প্রকৃতির যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব হয়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ করছেন, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন!''

শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্মের পক্ষে কোনও কর্মই সম্ভব নয়, শক্তির সাহায্য ছাড়া। তাই শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর শক্তিকে দিয়ে এই জগৎকল্যাণরূপ কার্য সম্পাদন করলেন। বলাই বাহুল্য, একথা ভাবলে ভুল হবে যে দুজনের শক্তি আলাদা। এই শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে এবং তাঁর অপ্রকটকালে শ্রীশ্রীমায়ের মধ্য দিয়ে জগতে পরিব্যাপ্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। এ-প্রসঙ্গে গীতার একটি শ্লোক খুবই প্রাসঙ্গিক : ''ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।'' (৯।১০)

তাই জগৎ সেদিন সেই অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা ঘটতে দেখেছিল ভাবী রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সূতিকাগারে। এখানেই রাখাল প্রভৃতি বালক সাধকেরা তাঁদের সাধনজীবন শুরু করেছিলেন। সাধনার উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, আর মায়ের কাছেই জ্ঞানের চাবি, তাই গুরুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানের দেবীর আবাহন করলেন। দেবী ষোড়শীরূপে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা করে ভাবী সঙ্ঘের এই সূতিকাগারকে এযুগের শ্রেষ্ঠ শক্তিপীঠে পরিণত করলেন।

সাধকের হৃদয়পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় জ্ঞানসূর্য উদয় হলে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণও সাধকদের হৃদয়পদ্ম উৎসারিত করার জন্যই 'বালার্কমণ্ডলাভাসাং' শ্রীবিদ্যার আরাধনা করলেন তাঁর বালক ভক্তদের সাধনজীবনের শুরুতেই। শ্রীশ্রীমাকে পরবর্তী কালে স্বামী অভেদানন্দ 'শুভ্রাং জ্যোতির্ময়ীং' বলে বর্ণনা করেছেন। ফলহারিণী অমাবস্যায় সারদারূপিণী দেবী ষোড়শীর মাতৃত্ব উদ্বোধিত হল। সাধকের সাধনার ফল শুচিশুভ্র কিন্তু তাঁকে অজানা অজ্ঞান-অন্ধকারের পথ ধরেই এগোতে হয়, তাই আরাধ্যা দেবী জ্যোতির্ময়ী হলেও তিথি ঘোর অমানিশা।

শ্রীশ্রীমা বলতেন, ''ঠাকুর তো আর ভাঙতে আসেননি।'' সত্যিই শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যা কিছুই দেখা যায় তা পূর্বতনের যুগোপযোগী সংস্করণ। সঙ্ঘের শিশুকালে মাতৃস্নেহ ও মাতৃনিয়ন্ত্রণের যুগপৎ প্রয়োজন। তাই ত্রিকালদর্শী পুরুষ তাঁর সন্তানদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তাঁদের আরাধ্যা দেবীরূপে সারদার প্রতিষ্ঠা করলেন। শিবাবতার আচার্য শংকরও দশনামী সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করে শৃঙ্গেরী মঠে দেবী ষোড়শী সারদার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দেবী ষোড়শী ও সারদা সেই এক আদ্যাশক্তির প্রকাশ।

নাম ও রূপ ভেদে, দেশ ও কাল ভেদে, পাত্রের আবাহনে তিনি 'যেখানে যেমন সেখানে তেমন'।

জীবের উদ্দেশ্য শিবত্বপ্রাপ্তি। সহস্রারে সেই পরম শিব মগ্ন মহাযোগে। একমাত্র শক্তির প্রসাদেই শিবের জাগরণ তথা কৃপালাভ সম্ভব। এদিকে শক্তিরূপিণী কুলকুণ্ডলিনী মূলাধারে নিদ্রাগতা। আর সাধককে এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সহায়তাতেই ধীরে ধীরে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্রের বিস্তীর্ণ পথ অতিক্রম করতে হবে। এজন্য কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাতে হবে, তাঁকে প্রসন্ন করতে সাধন করতে হবে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের জন্মলগ্নে শ্রীশ্রীমাকে আরাধ্যা দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা করলেন যাতে নবীন সাধকরা চৈতন্যরূপিণী শক্তিস্বরূপিণী মায়ের প্রসাদে শিবত্বপ্রাপ্ত হন।

দেবী ষোড়শীর ধ্যানে পাই—'জগদাহ্লাদজননীং জগদ্রঞ্জনকারিণীম্' অর্থাৎ দেবী জগতকে আহ্লাদিত করছেন, আনন্দিত করছেন। শ্রীশ্রীমায়ের ধ্যানে পাই 'প্রসন্নবদনাং দেবীং' অর্থাৎ তিনিও প্রসন্না, আনন্দময়ী। এ-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণেরও সমর্থন পাওয়া যায়। ষোড়শীপূজার আগেই তিনি শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, ''সাক্ষাৎ আনন্দময়ী-রূপ বলে তোমায় সর্বদা সত্য সত্য দেখতে পাই।'' শ্রীশ্রীমা শ্রীমুখে বলেছেন, নহবতে থাকাকালীনই তিনি অনুভব করতেন যে তাঁর হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত আছে।

'শতরূপে সারদা' গ্রন্থে 'স্বে মহিম্নি' প্রবন্ধে স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ লিখেছেন, ''কালী, তারা, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি দেবীগণ পরাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি। কিন্তু শ্রীবিদ্যা বা ষোড়শীবিদ্যা পরমা শক্তির মুখ্য প্রকাশ বা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ। দেবীর একটি মন্ত্রের নাম ত্রিকূট মন্ত্র। এই ত্রিকূট মন্ত্রের একটি অংশের নাম বাগ্‌ভবকূট, অপরটি কামরাজকূট, এবং অন্যটি শক্তিকূট। এই তিনটি অংশ লইয়াই ত্রিকূট মন্ত্র। আদ্যা শক্তি ত্রিপুরা জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াময়ী। বাগ্‌ভবকূট জ্ঞানকে প্রকাশিত করিতেছে, যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। কামরাজকূট ইচ্ছাকে প্রকাশিত করিতেছে এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী। শক্তিকূট ক্রিয়াকে প্রকাশিত করিতেছে এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গা বা বগলা। ত্রিকূট মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষোড়শীর এই সকল দেবীই অংশ বা বিভূতি। সুতরাং শ্রীসারদাদেবী এই ষোড়শীর মানববিগ্রহ বলিয়া বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিতে তাঁহাকে কালী, সরস্বতী, বগলা, পরমা প্রকৃতি প্রভৃতি নামে অভিহিত করা যায়।''

দেবী ত্রিগুণময়ী; বাগ্‌ভবকূট, শক্তিকূট এবং কামরাজকূটে যথাক্রমে দেবীর সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ প্রকাশিত। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে এই ত্রিবিধ প্রকাশই দেখা যায়। বাগ্‌ভবকূট অর্থাৎ সরস্বতীর প্রকাশ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, ''ও সারদা সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।'' শক্তিকূট অর্থাৎ দেবী বগলার প্রকাশ দেখা যায় কামারপুকুরে ভক্ত হরিশকে শাসনের সময়। মায়ের স্বীকারোক্তি : ''তখন... আমি নিজ মূর্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাঁটু দিয়ে জিব টেনে ধরে, গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে, ও হেঁ হেঁ করে হাঁপাতে লাগল।'' পরিশেষে কামরাজকূট অর্থাৎ দেবী কালিকার প্রকাশ। কামারপুকুর থেকে জয়রামবাটী যাওয়ার পথে শিবুদার প্রশ্নের উত্তরে মা স্বীকার করেছিলেন : ''লোকে বলে কালী।'' ডাকাত দম্পতি তেলোভেলোর মাঠে তাঁকে কালীরূপে দেখেছিল। সাধারণ মানবীর মতো লীলাকারিণী শ্রীশ্রীমা স্বয়ং সেই আদ্যাশক্তি, পরমাপ্রকৃতি; আর কালী, দুর্গা প্রমুখ দেবী তাঁরই অংশসম্ভূত।

আজ ষোড়শীপূজার প্রাক্‌লগ্নে দেবী ষোড়শীকে প্রণাম জানাই; এবং সর্বদেবদেবীস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীকে প্রণাম জানাই। ✠

ধারাবাহিক রচনা

বিদ্যাসাগর সমীপে শ্রীরামকৃষ্ণ : কিছু ভাবনা

অভিজিৎ মাইতি

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন তার অনেক আগে থেকেই বিদ্যাসাগরের কর্ম বহুসহস্রমুখে প্রসারিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল বললেন, কর্ম নিষ্কামভাবে করতে হবে, তাহলেই ঈশ্বরলাভ সম্ভব। তাঁর আর একটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : ''এ যা বললুম, বলা বাহুল্য আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই।'' এই মন্তব্যটি আমাদের কিছু ধন্ধে ফেলে। মনে প্রশ্ন আসে, যে-কর্মযোগ তিনি বিদ্যাসাগরকে বলেছেন তা বিদ্যাসাগর আগে থেকেই জানেন কোন অর্থে? বিদ্যাসাগরের 'জানা' আর শ্রীরামকৃষ্ণের 'জানা' দুটো এক না পৃথক? এক হলে কীভাবে? পৃথক হলে কতটা পৃথক? আর যদি বিদ্যাসাগর জানেনেই তাহলে সেই জানার 'খপর' নেই কেন? সেই 'খপর'-এর স্বরূপই বা কী? আমরা এইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সর্বোচ্চ গুণ বলে চিহ্নিত করেছিলেন তাঁর অজেয় পৌরুষকে। এই পৌরুষের আত্মশক্তি বিদ্যাসাগরের সরলতা।[৩৩] রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিয়ে বলছেন, বিধবাদের দুর্দশায় সাধারণ বাঙালি যখন হাহুতাশ করে, তাদের বৈধব্যজীবনের পবিত্রতা নিয়ে আকাশকুসুম আদর্শের কল্পনা করে কাব্য লিখতে বসে তখন বিদ্যাসাগর বিধবাদের দুঃখে আত্যন্তিক পীড়িত হয়ে তাদের দুর্দশা দূর করার জন্য জীবনপণ সংগ্রামে নেমে পড়েন। এভাবে মানুষের জন্য বিদ্যাসাগরের বেদনাবোধ, সত্যের অপলাপ না ঘটিয়ে যেভাবে ঋজুতায় কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় তাকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সরলতা' এবং তাই 'যথার্থ সরলতার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সুবৃহৎ সরলতা থাকে।' 'সুবৃহৎ সরলতা'তেই একজন ব্যক্তি সমষ্টির মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করে দিতে পারেন। এই সরলতা যে বোকামি নয় বা দুর্বলতা নয় তার প্রমাণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন কীভাবে বিদ্যাসাগর কাশীর পণ্ডিতদের দাবিকে বলিষ্ঠ সরলতায় অস্বীকার করেছিলেন। রামকৃষ্ণ যে মন ও মুখ এক করে চলার কথা বলেন সেখানে সত্যকে আশ্রয় করে থাকার জন্যই এরকম বলিষ্ঠ সরলতা আবির্ভূত হয়। সেই সরলতাই অর্থাৎ সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিত্বই 'যথার্থ পৌরুষ'। আবার এই 'যথার্থ পৌরুষে'র একটি

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়, জাঙ্গীপাড়া, হুগলি

ঐতিহাসিক রূপ আছে, মূল্য আছে। বিনয় ঘোষ বিদ্যাসাগরকে নিয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে বিদ্যাসাগরের দয়াদাক্ষিণ্য, মহানুভবতা, মাতৃভক্তি প্রভৃতি গুণ মহৎ হলেও ব্যক্তিচরিত্রের উপাদান হিসাবে তার কোনও যথার্থ ঐতিহাসিক মূল্য নেই। কেননা এইসব গুণ অনেকের মধ্যে থাকলেও তাঁরা বিদ্যাসাগর হন না বা শুধুমাত্র এই গুণগুলোর জন্যই বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর হননি।[৩৪] বিনয় ঘোষের মতে উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক মূল্য এখানেই যে, তাঁর সমস্ত কাজকর্ম ছিল মানবকেন্দ্রিক এবং তিনি প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে তাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন আধুনিক ইওরোপীয় জ্ঞানচর্চার সামনে। দুই গোলার্ধের যা কিছু ভাল তা-ই তাঁর কাছে গৃহীত হয়েছে সমান শ্রদ্ধায়। ইওরোপীয় রেনেসাঁসের সময়ে যেমন প্রাচীন গ্রিক ও লাতিন classical সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক দেখা গিয়েছিল তেমনই বিদ্যাসাগরও দাঁড়িয়েছিলেন প্রাচীন সংস্কৃত classical সাহিত্যের সামনে। অতীত প্রত্যাবর্তনের প্রধানতম কারণ প্রাচীন সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নীতিকথা, পুরাণকথা, শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্র থেকে মানবমুখীন জীবনধর্মী আদর্শের পুনরাবিষ্কার।[৩৫] উচ্চহৃদয়ানুভূতিতে দ্রবীভূত বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ কথিত 'সরলতা'য় বলিষ্ঠ বিদ্যাসাগর প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রবেশ করে নিশ্চয়ই আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন মানুষের জন্য মানুষের কল্যাণবোধের উচ্চ অনুভূতিগুলি। যে-অনুভূতির আশ্রয়ে তৈরি হয়েছে ভারতের আদর্শের ঐতিহ্য। বিদ্যাসাগর এমন ঐতিহ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই ভারতের মহীয়সী নারীদের মধ্য থেকে আদর্শ নারী হিসাবে আবিষ্কার করেছিলেন সীতাকে।[৩৬] সীতার পাতিব্রত্যের মধ্যে উচ্চ ত্যাগের আদর্শকে তিনি ধরতে পেরেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের আন্তরিক 'সরলতা'র সঙ্গে আর একটি বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত হয়েছিল যাকে প্রসঙ্গান্তরে রবীন্দ্রনাথ চিহ্নিত করেছিলেন 'মনন' বলে। তাঁর মতে বিদ্যাসাগরের মতো মানুষেরা এই 'মননে'র দ্বারা 'অন্তরজীবনের পরমার্থ'কে লাভ করেন। এই পরমার্থ হল তা-ই যাতে 'সত্য', 'দিব্য' ও 'অনন্ত' প্রকাশিত।[৩৭] এভাবেই পরমার্থে প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষদের বাইরের জীবন ওই আন্তর পরমার্থের আলোকেই উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে।

পরমার্থের আলোকে উদ্‌ভাসিত হয়েছিলেন বলেই বিদ্যাসাগর কর্মে সেই আলোকেরই বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে গেছেন। অতএব স্বার্থ থেকে যিনি পরমার্থে যেতে পারেন তিনি সত্য, দিব্য ও অনন্তকে ছুঁতে পারেন। প্রথাগত ধর্মবিশ্বাস ছাড়াও স্বার্থত্যাগের এই প্রক্রিয়া মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে নিঃস্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠায়। বিবেকানন্দ কর্মযোগীর ওই ক্রমাগ্রগতির পথটিকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে : ''কর্মযোগীর কোন প্রকার ধর্মমতে বিশ্বাস করিবার আবশ্যকতা নাই। তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিতে পারেন, আত্মা-সম্বন্ধে অনুসন্ধান না করিতে পারেন, অথবা কোন প্রকার দার্শনিক বিচারও না করিতে পারেন, কিছুই আসে যায় না। তাঁহার বিশেষ উদ্দেশ্য নিঃস্বার্থপরতা লাভ করা এবং তাঁহাকে নিজ চেষ্টাতেই উহা লাভ করিতে হইবে।''[৩৮]

অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে স্বার্থহীন কর্ম করতে করতে যখন মানুষ নিজের একটিও স্বার্থ অবশিষ্ট রাখবে না তখন বিশ্বব্যাপী নিঃস্বার্থপরতায় সে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। সেই চরম নিঃস্বার্থপরতা-প্রাপ্তির মুহূর্তটিকে ঈশ্বর বলে অভিহিত করে বিবেকানন্দ ঈশ্বরের অদ্ভুত ও সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দিয়েছেন : ''নিঃস্বার্থতাই ঈশ্বর।''[৩৯] নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারা মানুষ অজান্তেও পৌঁছে যায় নিঃস্বার্থপরতা ও ঈশ্বরের অভেদ-ভূমিতে। এবার বোঝা সম্ভব, কেন বিদ্যাসাগরকে

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ''এ-যা বললুম, বলা বাহুল্য আপনি সব জানেন—তবে খপর নাই।''

এখন প্রশ্ন হল, যে-'খপর'-এ বিদ্যাসাগর নিজেই পৌঁছতে পারতেন সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের মতো করে 'খপর' পৌঁছে দিতে আগ্রহী হলেন কেন? মনে হয় এর দুটি কারণ : এক, কর্মীকে জীবনের লক্ষ্যে সচেতন করার জন্য ও কর্মীর কর্মপন্থাকে সরস করার জন্য এবং দুই, যে অন্যজনের হিতার্থে কর্ম করে তাকেও আত্মশক্তিতে ও বোধশক্তিতে উন্নীত করার পথ দেখানোর জন্য। কর্মের মধ্যে নিষ্ঠুর পাকচক্র আছে। মানুষ যখন কারও উপকার করে তখন উপকৃতের কাছ থেকে অনেক সময়ই কিছু প্রত্যাশা করে। কিছু না হোক অন্তত কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করে, যদিও এটিই মানুষের কর্মের পাকচক্রকে সবথেকে বেশি ভয়াবহ করে তোলে। সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে না বেরোতে পারে উপকারকারী, না উদ্ধার হতে পারে উপকৃত। এই কামনা-বিজড়িত কর্ম সবসময়ই পরিত্যাজ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন বিদ্যাসাগরের মতো মহৎপ্রাণ ব্যক্তি সাধারণ কর্মীর মতো সবসময় সকাম কর্ম করবেন এমন নয়, কিন্তু কর্মের মধ্যে যেকোনও সময় সকাম কর্ম প্রশ্রয় পেতে পারে। তাই একাধিকবার সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরকে দ্রুত পাওয়া যায়। মানুষের প্রতি উজাড় করা হৃদয়বত্তা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর নাকি শেষজীবনে মানুষেরই ওপর বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, ''অমুক আমার নিন্দা করেছিল? কই, আমি তো তার উপকার করেছি বলে মনে পড়ছে না!'' প্রসঙ্গটি সত্য-মিথ্যা যাই হোক একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানুষের স্বার্থপরতা মহৎপ্রাণকেও তিতিবিরক্ত করতে পারে। মানুষের স্বার্থপরতার ক্লেদ-ক্লিন্ন রূপকে চিহ্নিত করেছেন বিবেকানন্দ সেই কবিতাতেই যেখানে তিনি বলেছেন প্রবাদ হয়ে ওঠা সেই চরণদ্বয় ''ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়।/... জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'' কিন্তু ব্রহ্মব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের সামূহিক বোধে উত্তীর্ণ হওয়ার আগে লিখলেন, নিঃস্বার্থ হৃদিবান প্রেমিকের এ-জগতে স্থান নেই; ''হও জড়প্রায় অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল—/ সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান।'' স্বার্থপর জগৎসংসারের ওপরেই নিঃস্বার্থপর প্রেমভাবনায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নিষ্কাম কর্মসাধনার মাধ্যমে। এর মাধ্যমেই সংসারের স্বার্থসংঘাতে হৃদিবান প্রেমিকের কারুণ্য কঠিনতায় কলুষিত হয়ে উঠবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের কাছে এই খবরটিই এনে দিয়েছিলেন যে, নিষ্কাম কর্ম জীবনের উপায়, উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরই জীবনের উদ্দেশ্য এই বোধ ঋজু ও স্পষ্ট হলে উদ্দেশ্যের মোহনস্পর্শে উপায়ও প্রাণসঞ্জীবিত হয়ে ওঠে; কর্মচক্রের ঘর্ষণে উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ ক্রমশ প্রশমিত হয় এবং পরিবর্তিত হয় পূজার উপচারে। তখন শুধু মানুষ নয়, সর্বজীবে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের প্রতি করুণাবিগলিত ও পূজানিবেদিত কর্ম ধাবিত হয়। এভাবে কর্মে মেশে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন ''তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ'', বিদ্যাসাগরের কাছে সেই কীর্তি-অতিক্রান্ত মহৎ জীবনের প্রতি সচেতনতা ও পথ চলার আনন্দবার্তাটি নিয়ে এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

এবার দ্বিতীয় ভাবনাটি। সাধারণ কর্মপদ্ধতিতে এই দ্বিতীয় ভাবনাটি বেশিরভাগ সময় উপেক্ষিত থেকে যায়। সকাম কর্মে যে-প্রত্যাশা তৈরি হয় তার প্রতিক্রিয়া মারাত্মক। তা কেবল কর্মীকে পরাভূত করে তাই নয়, উপকৃতকেও পর্যুদস্ত করে। দক্ষিণেশ্বরে একদিন বৈষ্ণব ধর্মের 'দয়া'র প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ তরুণ শিষ্যদের বলেছিলেন 'দয়া'র পরিবর্তে 'সেবা'র কথা—শিবজ্ঞানে জীবসেবার কথা।[৪০]

বাস্তবে দেখা যায় দয়াকারী এই ভাব নিয়ে দয়া করে যে, যাকে দয়া করা হচ্ছে সে দয়ার পাত্র। তাই দয়াকারীর স্থান দয়াপাত্রের থেকে ওপরে। এতে যেমন দয়াকারী নিজের অহংকারকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলে তেমনি তার দানগ্রহণের বোঝায় দয়া গ্রহণকারীর আত্মসম্মান ভূলুণ্ঠিত হয়। ফলে দয়া গ্রহণকারীর ভেতরের সামর্থ্য কখনও প্রকাশিত হতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞানে সেবা করলে সেবক এই ভাব নিয়ে সেবা করে যে, সেবিতের অন্তরে শিব বিরাজিত এবং তিনি দয়া করে সেবা নিচ্ছেন বলেই সেবক সেবার সুযোগ পাচ্ছে। এভাবে সেবক কর্মের অহং থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে এবং শিবজ্ঞানে সেবা করে নিজেরই কল্যাণ করে। বিদ্যাসাগরকে শ্রীরামকৃষ্ণ এজন্যই বলেছিলেন, ''যে-লোক কামনাশূন্য হয়ে কর্ম করবে সে নিজেরই মঙ্গল করবে।''[৪১] অন্যদিকে সেবিতের মধ্যে সেবাগ্রহণের কৃতজ্ঞতাভার থাকে না বলেই এবং সেবকের উচ্চাদর্শে সেও স্নাত হয় বলেই তার মধ্যের আত্মশক্তি জাগ্রত হতে পারে। এভাবে ব্যক্তিমানুষের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সমষ্টির কোনও বিরোধ সংঘটিত হয় না তো বটেই বরং ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়েরই সার্বিক মঙ্গল সাধিত হয়। লক্ষণীয়, আধুনিক সভ্যতা ব্যক্তি ও সমষ্টির উন্নতিসাধনের যোগ্যতম উপায় সন্ধান করতে কসুর করেনি। সাম্যবাদী চিন্তা, গণতান্ত্রিক চিন্তা প্রভৃতি নানাধরনের চিন্তাভাবনায় মানুষের কল্যাণের উপযুক্ত পথের অনুসন্ধান পরীক্ষিত হয়ে গেছে। অনেকে এও মনে করেছেন, মানুষের উন্নতির পথে ধর্ম ও ঈশ্বরভাবনা প্রধান অন্তরায়।[৪২] কোনও দার্শনিক ঘোষণা করেছেন ঈশ্বরের মৃত্যু। কিন্তু তারপরেও কেউ শোনাতে পারেনি লোভ ও বিদ্বেষের মৃত্যুসংবাদ। বিবেকানন্দ পূর্বোক্ত 'সখার প্রতি' কবিতায় দেখালেন স্বার্থকলুষিত সংসারের নির্দয় রূপ কিন্তু তিনি এই কলুষতা থেকে মুক্তির বোধে উত্তীর্ণ হওয়ার কথাও শোনালেন; দেখালেন সর্বভূতে ঈশ্বরের উপস্থিতির ভাব নিয়ে লোভ ও বিদ্বেষের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে সার্বিক কল্যাণ সম্ভব, যে-ভাবের উৎস শ্রীরামকৃষ্ণে।

বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সমগ্র সাক্ষাৎকারে শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধা জানালেন, ভক্তিপথকে সহজ বললেন, কর্মরহস্য উন্মোচন করলেন নতুন যুগের জন্য আর নিজে দাঁড়িয়ে রইলেন সান্ত ও অনন্তের মাঝখানে সেতুবন্ধের মতো। তবে পাঠক একটু সচেতনভাবে লক্ষ করবেন এই সেতুবন্ধনের প্রচেষ্টায় তাঁর অবস্থান ছিল দুরকম। সমাধিস্থ হওয়ার আগে পর্যন্ত শাস্ত্র, ভক্তিপথ প্রভৃতি যত প্রসঙ্গের আলোচনা করেছেন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তিনি যেন নিজের পূর্বানুভূতির সাক্ষ্যে মর্ত্যভূমি থেকে অনন্তের অভিমুখে অভিযাত্রাকে সজীব করে তুলেছেন। কিন্তু সমাধির পরে ব্যুত্থিত তিনি যেন অনন্ত থেকে সদ্য নেমে এসে হাত বাড়িয়েছেন সীমার অভিমুখে। প্রথমটি যদি হয় প্রেরণা তাহলে দ্বিতীয়টি সংশয়নাশী আশ্রয়; প্রথমটি যদি হয় দিঙ্‌নির্দেশ দ্বিতীয়টি তাহলে নির্দেশিত দিক্-লক্ষ্য থেকে জ্বলন্ত সাক্ষ্যসংগ্রহকারী প্রত্যাবর্তন। এমন প্রত্যাবর্তনের পরেই উচ্চারিত হতে পারে এমন বেদবাক্য : ''ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি!''[৪৩]

উনিশ শতকের নবজাগ্রত আধুনিকতার অন্যতম পুরোধাপুরুষ বিদ্যাসাগরের করুণাবিগলিত হৃদয় সংযুক্ত ছিল প্রাচীন ভারতের ত্যাগের ঐতিহ্যের সঙ্গে। ভারতীয় দর্শনে সংশয়ী বিদ্যাসাগর কোনও ভোগবাদী দর্শনকে গ্রহণ করেননি বরং ভারতের ত্যাগের আদর্শ তাঁর মানবকল্যাণকারী আধুনিক হৃদয়বত্তার সঙ্গে পরিপূরক সম্পর্কে অন্বিত হয়েছে এবং বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ঐতিহাসিক মূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে

কথোপকথনে প্রাচীন শাস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ করে আগাগোড়া ভারতের ত্যাগের মহান আদর্শকেই একমাত্র আদর্শ হিসাবে তুলে ধরেছেন। সহৃদয় বিদ্যাচর্চায়, নিঃস্বার্থ ঈশ্বরপ্রেমে, নিষ্কাম কর্মে যে-ত্যাগ আছে, প্রতি ক্ষেত্রে সেই ত্যাগের মহিমার আলোকশিখাটিকেই উজ্জ্বলতর করে দেখিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বিদ্যাসাগর সচেতনভাবে কতটা ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন বা ছিলেন না সেই তথ্যের আবিষ্কারের থেকেও তাই রবীন্দ্রনাথের এই দিঙ্‌নির্দেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে—বিদ্যাসাগরের মধ্যে ছিল 'পরমার্থ', যে-পরমার্থের সত্য, দিব্য ও অনন্তকে ছুঁয়ে ছিলেন তিনি—সর্বমানবের জন্য তাঁর হৃদয় উজাড় করা ভালবাসার দ্বারা, শতসহস্র পরার্থপর কর্মের দ্বারা, ব্যক্তিগত স্বার্থ অতিক্রমকারী 'মননে'র দ্বারা। বিদ্যাসাগরের মধ্যেকার 'পরমার্থে'র সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ কেবল যোগ করলেন সচেতনভাবে ঈশ্বরবিশ্বাস করার কথাকে। পরিপূর্ণ মানবত্ব আর সেই মানুষেরই বিকশিত দেবত্বকে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত দেখালেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কাঠুরের গল্প বলে মানবসম্ভাবনার সীমাকে ভেঙে দিলেন। বিবেকানন্দ তাঁর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ''কিন্তু 'ইতি' করিবার শক্তি কাহারও নাই। ঈশ্বরেরও আপনাকে limited (সীমাবদ্ধ) করিবার শক্তি নাই।"[৪৪] পরবর্তী কালে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচকেরা কেবলমাত্র মানবতাবাদী বিদ্যাসাগরকে বড় করে তুলতে গিয়ে মানব-সম্ভাবনার 'ইতি'কে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর সাক্ষাৎকার থেকে এযুগের আহরণযোগ্য কোনও তাৎপর্যকে তাই খুঁজে পাননি তাঁরা। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের কথা বলা যায় বলে যে-সংবাদ দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, সে-সংবাদটিও থেকে গেছে অন্তরালে। বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন কী না সেই বিতণ্ডায় আমরা অংশ নিতে নিতে বিস্মৃত হয়ে গেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের পরিবেশিত সংবাদটি আমাদের যুগের কাছে কোনও উত্তরাধিকার তুলে দিয়ে গেছে কী না! একদিন জীবনজিজ্ঞাসায় উদ্‌ভ্রান্ত নরেন্দ্রনাথ তীব্র আকুতিতে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন কী না। শ্রীরামকৃষ্ণ মুহূর্তে সপ্রতিভ উত্তরে তা-ই বলেছিলেন যা বলেছেন বিদ্যাসাগরের সামনে—ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। সেই আশ্বাসবাক্যটিকে অবলম্বন করে নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হয়েছিলেন। সমকালের ও পরবর্তী কালের পৃথিবী তর্কাতীতভাবে বিবেকানন্দের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে পরিপূর্ণ মানুষকে, যুগাচার্যকে—যাঁর পায়ের তলায় বসে আধ্যাত্মিকতার নতুন পাঠ গ্রহণ করা গেছে। পরবর্তী কালে যদি কেউ পূর্ণ মনুষ্যত্বের অনুসন্ধান করতে চায় তাহলে তাকে তাকাতে হবে আলোচ্য সাক্ষাৎকারটির দিকে; যদি মানুষ মানুষকে ভালবেসে আবার মানুষের ওপর সন্দিহান হয়ে ওঠে, যদি মানুষের সর্বজয়ী শক্তিতে আস্থা ও শ্রদ্ধা রেখে মানুষেরই সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করতে চায় তাহলে সেই বিপন্ন সময়ে তাকে তাকাতে হবে আলোচ্য সাক্ষাৎকারটির দিকে। পারিবারিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক জীবনে 'অন্নগতপ্রাণ' মানুষ যদি মানুষের স্বার্থপরতায় ব্যথিত হয়, যদি ভোগক্লান্তির নৈশকালিমায় হারিয়ে যেতে যেতে, ইহজীবন-উপযোগী নীতি ও মূল্যবোধ আহরণ করে পারিবারিক-সামাজিক-রাষ্ট্রিক জীবনের প্রগতিপত্রটিকে সুখ-সমৃদ্ধি-শান্তি দিয়ে তৃপ্ত করতে চায় তাহলে তাকে তাকাতে হবে আলোচ্য সাক্ষাৎকারটির দিকে। আর যদি মানুষ ধর্ম ও দর্শনগ্রন্থের মধ্য থেকে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সারবস্তুকে আহরণ করে নিজের জীবনের সীমাকে অসীমতায় প্রসারিত-বিকশিত করতে চায়, ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুযায়ী জ্ঞান, ভক্তি বা কর্মযোগের মধ্য দিয়ে অথবা এই পথগুলির একাধিক বা সবগুলির

মধ্য দিয়ে ধর্মীয় জীবনযাপনে স্পষ্ট ও ঋজু পথ খুঁজতে চায় তাহলে তাকে তাকাতে হবে আলোচ্য সাক্ষাৎকারটির দিকে। জীবন-রহস্যের সমাধানকারী কোনও আধুনিক মানুষ তখন যদি উচ্চারণ করেন 'After Ramakrishna I follow Vidyasagar'[৪৫] তাহলে সেই মন্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবন নিশ্চয়ই কঠিন হবে না। বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে লিখছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ''নিজেকে মারতে হলে একটি নরুন দিয়ে হয়, কিন্তু অপরকে মারতে গেলে ঢাল তরবারের দরকার।''[৪৬] অর্থাৎ প্রত্যেকের নিজের জীবনে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তিটিকে অর্জন করতে হলে নিজস্ব-উপযোগী একটি প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা বোধ বা একটি সামান্য অস্ত্রই যথেষ্ট। যদিও নিজের জন্য শ্রেষ্ঠ অস্ত্রটির অনুসন্ধানে অভিযাত্রা এবং অস্ত্রটির প্রাপ্তি খুব সহজ নয়। তাই সোনার ফসলের কৃষক অন্যের জীবনে সোনার ফসল ফলানোর পর যদি নিজের জীবনে পরিপূর্ণ-সার্থকতার সন্ধান করতে চায় তাহলে বিপুল কর্ম-পরিশ্রমের পরে তাকে নিজের মধ্যে খুঁজতে হবে এমন একটি 'নরুন'কে যা তাকে তার নিজের জীবনে কাঙ্ক্ষিত সার্থকতা এনে দিতে পারবে। কর্মে প্রয়োজন ঢাল-তলোয়ার, কর্মযোগে প্রয়োজন ঢাল-তলোয়ার এবং ওই 'নরুন'টি। সমষ্টিজীবনে তাকালেও নরুনের প্রসঙ্গটি তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠবে সমানভাবে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ঢাল-তরবার নিয়ে আধুনিক যুগ সভ্যতার পথযাত্রায় দিকে দিকে কীর্তিস্তম্ভ রচনা করে চলেছে। কিন্তু কীর্তিস্তম্ভের ছায়াতলে কীর্তিমানের খোঁজ অবহেলিত থাকতে পারে না তো কোনওকালেই! ফলে আগত-অনাগত সভ্যতা যদি নিজের তৈরি কীর্তিস্তম্ভকে অতিক্রম করে 'নিজেকে মারতে', নিজের জন্য ঠিক ঠিক উপযুক্ত 'নরুন'টি খুঁজতে চায় তাহলে মানবসভ্যতাকে তাকাতে হবে আলোচ্য সাক্ষাৎকারটির দিকে। তাই বলা যায়, উনিশ শতকে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় বিদ্যাসাগরের জন্য ওই 'নরুন' নিয়ে গিয়েছিলেন এবং কেবলমাত্র বিদ্যাসাগরের জন্য নয়, চিরকালের জন্য সেদিন কলকাতায় 'নরুন' বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাই ওই 'নরুন'টির প্রয়োজন আজও ফুরিয়ে যায়নি, কোনওকালে ফুরোবে না।

তথ্যসূত্র

৩৩। দ্রঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, চারিত্রপূজা, 'বিদ্যাসাগর-চরিত ১', খণ্ড ১১, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ১৮২ [এরপর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*]

৩৪। বিনয় ঘোষ, *বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ*, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৪, খণ্ড ১, পৃঃ ৫

৩৫। তদেব, পৃঃ ৫২-৫৪

৩৬। দ্রঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *রসসাগর বিদ্যাসাগর*, নাভানা, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃঃ ৩৭-৩৮

৩৭। দ্রঃ *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, খণ্ড ১১, পৃঃ ১৮৭

৩৮। স্বামী বিবেকানন্দ, *স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা*, কর্মযোগের আদর্শ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০১, খণ্ড ১, পৃঃ ১০৯

৩৯। তদেব, অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ, পৃঃ ৮৯

৪০। দ্রঃ স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ*, ভাগ ২, ঠাকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০, পৃঃ ১৩১

৪১। শ্রীম-কথিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, অখণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০১, পৃঃ ৫৬

৪২। স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ, *বোধিবৃক্ষ-তলে*, সূত্রধর, কলকাতা, ২০১৯, পৃঃ ৯২

৪৩। *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, পৃঃ ৫৬

৪৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী*, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০০০, পৃঃ ৩২ [এরপর, *পত্রাবলী*]

৪৫। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ২০১২, খণ্ড ৩, পৃঃ ২৩৩

৪৬। *পত্রাবলী*, পৃঃ ২৩০

রবীন্দ্রমানসে আলো ও অন্ধকার

কর্ণিকা সেন

বাইবেলে আছে, God said, "Let there be light. And there was light." সৃষ্টির সেই ঊষালগ্নে আলো ঈশ্বরের আশীর্বাদ হয়ে পৃথিবীতে এসেছিল। চিরন্তন এই আলোর পিপাসাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, বিশেষত তাঁর গানে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। নিজের সত্তায় তিনি আলোর স্পর্শ অনুভব করতেন। ভুবনজোড়া যে-আলো সে-আলো তো কবিরও চোখে। সে-আলোই তাঁর হৃদয় ভরিয়ে দেয়। সেই আলোর স্রোতেই বিশ্বচরাচর ভেসে যায়, প্রজাপতিরা পালতোলা নৌকার মতো ভেসে বেড়ায়, ফুলেরা আলোর নেশায় মাতাল হয়ে যায়। আকাশের মেঘ সেই আলোর ছোঁয়া পেয়ে মানিকের মতো জ্বলে, গাছের পাতা আনন্দে নেচে ওঠে। সেই আলো একান্তভাবে কবিরই। তার উৎস তাঁর প্রাণে। তাই তিনি অনায়াসেই বলতে পারেন : ''আলো আমার আলো ওগো আলো ভুবনভরা...।''

এই আলোর সুর কবির প্রাণে বেজে ওঠে। কেন তিনি জানেন না, কীসের নেশায় আনমনা হয়ে যান। আকাশ তাঁর মন কেড়ে নেয়, বাতাস কীসের আনন্দে তাঁকে ভরিয়ে দেয় কবি নিজেও তা জানেন না। শুধু এটুকু বুঝতে পারেন আকাশের শেষপ্রান্তে যে-আলোর ছায়া সেই আলো যেন তাঁর মনে ফুলের মতো ফুটে উঠেছে। তার সৌরভ তাঁকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে যার দিকে তিনি সারাজীবন ধরে চেয়ে আছেন (গীতালি, ৫৬) :

''আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো।
কে এল মোর অঙ্গনে কে জানে গো।
হৃদয় আমার উদাস করে
কেড়ে নিল আকাশ মোরে,
বাতাস আমায় আনন্দবাণ হানে গো।
দিগন্তের ওই নীল নয়নের ছায়াতে
কুসুম যেন বিকাশে মোর কায়াতে।
মোর হৃদয়ের সুগন্ধ যে
বাহির হল কাহার খোঁজে,
সকল জীবন চাহে কাহার পানে গো।''

আকাশ থেকে আলোক-ঝরনা ঝরে পড়ছে— কবি প্রার্থনা করছেন সেই আলোয় তাঁর মন শুদ্ধ পবিত্র হোক, মনের সব মলিনতা মুছে যাক। রাজপুত্র যেমন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে ঘুমন্ত

প্রাক্তন অধ্যাপিকা, ইংরেজি সাহিত্য, আর সি সি ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি

রাজকন্যাকে জাগিয়ে তুলেছিল, এই আলোর সোনার কাঠিও যেন ঠিক তেমন করে কবির মনের মাঝে যে ঘুমিয়ে আছে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। এই আলোর স্পর্শে তাঁর জীবন যেন নতুন করে শুরু হয়। তাঁর মনের বীণায় অমৃতের মতো যে-গান ঘুমিয়ে আছে সে জেগে উঠুক। তার সুরের বন্যায় পৃথিবী ভেসে যাক। আর সেই পাগলকরা গানের সুরে তাঁর মন যেন নত হয়ে যায়। এই বিশ্বচরাচরে যে-সুরের স্রোত অবিশ্রান্ত বয়ে যাচ্ছে তার কাছে যেন তাঁর হৃদয়ও নত হয়।

''আলোকের এই ঝর্নাধারায় ধুইয়ে দাও।... বিশ্বহৃদয় হতে-ধাওয়া আলোয়-পাগল প্রভাত হাওয়া,সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও।''

আলোর সুর কবির মনকে ভরিয়ে দেয়। তাঁর গৃহের প্রাঙ্গণে তিনি যেন কোন অচেনা অতিথির পদধ্বনি শুনতে পান। আকাশ তাঁকে পৃথিবীর মাটি থেকে তুলে নিয়ে কোন অপার্থিব আনন্দময় জগতের সন্ধান দেয়। তাঁর হৃদয় ফুলের মতো সুগন্ধ ছড়িয়ে কাকে যেন খোঁজে। কবি আজীবন যে-পরমপুরুষকে খুঁজে এসেছেন, তাঁরই দূত হয়ে আলো যেন আজ কবির কাছে এসেছে।

আবার যখন নিজের মনের গভীরে ডুব দিয়ে কবি তার দেখা পেয়েছেন তখন আনন্দে গেয়ে উঠেছেন : ''আলো যে যায় রে দেখা—
হৃদয়ের পুব-গগনে সোনার রেখা।''(গীতালি, ৫)

কবির মনের সব সংশয় কেটে গেছে। আকাশে সূর্য উঠলে যেমন সোনালি রেখা দেখা যায় কবির মনের আকাশেও আজ ঠিক তেমনই সোনালি রেখা। এ তাঁর হৃদয়দেবতার সঙ্গে মিলনের আলো।

দিশাহারা মানুষ অন্ধকার সমুদ্রে দিগ্‌ভ্রান্ত নাবিকের মতো ঘুরে বেড়ায়। তাদের সব পথ অন্ধকারে ঢাকা। যারা আলোর পিয়াসী তারাও আলো না পেয়ে হতাশার অন্ধকারে ডুবে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাই ঈশ্বরের কাছে পৃথিবীর সব আলোর পিয়াসী মানুষের হয়ে প্রার্থনা করছেন :

''আলোকের পথে, প্রভু দাও দ্বার খুলে—
আলোক-পিয়াসী যারা আছে আঁখি তুলে,
প্রদোষের ছায়াতলে হারায়েছে দিশা,
সমুখে আসিছে ঘিরে নিরাশার নিশা।''
(আনুষ্ঠানিক সংগীত, ১৫)

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে কবি তাঁর হৃদয়দেবতার দেখা পেলেন। সেই মিলনের মুহূর্তে শুধু আলো আর আলো। আকাশে আলো, গাছের পাতায় আলো, পাখির বাসায় আলো। সারা পৃথিবী জুড়ে শুধু আনন্দের আলো। তিনি যে 'আলোকময়' :

''আলোয় আলোকময় করে হে
এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হতে আঁধার
মিলালো মিলালো।'' (গীতাঞ্জলি, ৪৫)

রবীন্দ্রনাথ আলোর সঙ্গে পদ্মফুলের মিল খুঁজে পেয়েছেন। পদ্ম ফুটলে তার সুগন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়। শরতের নীল আকাশের আলো কবির চোখে তাই 'আলোর অমল কমল'। তাঁর মনের সব ভাবনাই সেই আলোর কমলের পথে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। সরস্বতীর মতো শরৎরানিও সেই আলোর কমলবনে বীণা বাজান ললিত রাগে। শিউলি ফুল সেই রাগের মূর্ছনায় ঝরে পড়ে। কচি ধানের সবুজ খেতে বাতাস মেতে ওঠে। অরণ্যে প্রাণের হিল্লোল শোনা যায়। আলো আর প্রাণ রবীন্দ্রনাথের কাছে দুটি শব্দই সমান :

''আলোর অমল কমলখানি /কে ফুটালে, নীল আকাশের ঘুম ছুটালে।.../আমার মনের ভাবনাগুলি/ বাহির হল পাখা তুলি,/ওই কমলের পথে তাদের/সেই জুটালে।.../শরৎরাণীর বীণা বাজে/ কমলদলে।/ললিত রাগের সুর ঝরে তাই/ শিউলিতলে।'' (শরতের ধ্যান)

আলোও তো মাঝে মাঝে হারিয়ে যায় কুয়াশার আড়ালে। কবি সেই বীরদের আহ্বান করেন যারা

কুয়াশা সরিয়ে সূর্যের আলো পৃথিবীতে নিয়ে আসবে : ''আলোক-চোরা লুকিয়ে এল ওই,/ তিমিরজয়ী বীর তোরা আজ কই।/এই কুয়াশা-জয়ের দীক্ষা/ কাহার কাছে লই।" (তপতী)

ভগবান আকাশ ভরে এত আলো জ্বালান কিন্তু তাঁকে তো দেখতে পান না কবি! সব আলোর পেছনে তিনি আছেন কিন্তু সামনে থেকে তো তাঁকে দেখা যায় না! কবির হৃদয়াকাশে যেদিন প্রেমের আলো জ্বলে ওঠে, সেই উৎসবের দিনে শ্রীভগবান সামনে আসেন। সব আলো তখন তাঁরই মুখের ওপর পড়ে, কবি চলে যান আড়ালে :

''এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে/ কী উৎসবের লগনে।/সব আলোটি কেমন করে/ফেল আমার মুখের পরে/আপনি থাক আলোর পিছনে।/প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয়-গগনে.../সব আলো তার কেমন করে/ পড়ে তোমার মুখের পরে/আপনি পড়ি আলোর পিছনে।" (গীতিমাল্য, ৬৬)

আলো আর আকাশ খুব প্রিয় ছিল কবির :

''আমি আকাশ এবং আলো এত অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসি! আকাশ আমার সাকী, নীল স্ফটিকের স্বচ্ছ পেয়ালা উপুড় করে ধরেছে, সোনার আলো মদের মতো আমার রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাকে দেবতাদের সমান করে দিচ্ছে। যেখানে আমার এই সাকীর মুখ প্রসন্ন এবং উন্মুক্ত, যেখানে আমার এই সোনার মদ সব চেয়ে সোনালি এবং স্বচ্ছ, সেইখানে আমি কবি, সেইখানে আমি রাজা, সেইখানে আমার বত্রিশ সিংহাসন।" (ছিন্নপত্র, ২১৭)

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর সেই বিরলতম কবিদের একজন যিনি আলো আর অন্ধকার দুয়েরই সৌন্দর্য দু-চোখ ভরে দেখেছেন। আলো কখন জ্বলবে কবির জীবনে? যখন তাঁর প্রাণের দেবতার সঙ্গে মিলন হবে। কিন্তু সেই মিলনের পথে রাতের ঘন অন্ধকার। তীব্র বিরহের যন্ত্রণা দিয়েই সেই আলো জ্বালাতে হবে। ভগবান ভক্তের জন্য অপেক্ষা করছেন—দুর্যোগের রাতে ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়েই তাঁর কাছে যেতে হবে। বিরহের আগুনে আলো জ্বালিয়ে সেই আলো দেখে কবিকে পথ চলতে হবে :

''কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো...
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।"(গীতাঞ্জলি, ১৭)

যে-আলো সুলভ সে-আলো ভগবানের নয়। অনেক যন্ত্রণায়, অনেক পথ পার হয়ে তবেই সেই আলোর দেখা মেলে।

''অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ-মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।" (গীতালি, ৯৯)

অন্ধকারেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাণনাথের স্পর্শ পান যাঁকে তিনি আলোয় দেখেছিলেন। কবি যখন আলো নিভিয়ে দিয়েছিলেন তখন শ্রীভগবানই নিজের হাতে ধ্রুবতারা জ্বালিয়ে পথ দেখালেন। অন্ধকারে তাঁর আলো জ্বলে উঠল :

''অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে
কখন তুমি এলে, হে নাথ, মৃদুচরণপাতে।...
যে নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো
তারই মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বালো।"
(রাজা)

অন্ধকারে তিনি লুকিয়ে আসেন। কঠিন হাতে তিনিই আবার বুকে টেনে নেন :

''লুকিয়ে আস আঁধার রাতে
তুমি আমার বন্ধু,
লও যে টেনে কঠিন হাতে
তুমি আমার আনন্দ।

দুঃখরথের তুমিই রথী
তুমিই আমার বন্ধু...।” (গীতিমাল্য, ৪৭)

তাই আলোয় নয়—অন্ধকারেই ভগবানকে আহ্বান করেন কবি। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। বারবার তাঁর জীবনে মর্মান্তিক শোকের ঝড় উঠেছে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস তিনি কখনও হারাননি। উৎসবের আলো না-ই বা জ্বলল, বাঁশি না-ই বা বাজল, অন্ধকারেই তিনি ঈশ্বরের আরাধনা করবেন :

‘‘যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারেবারে।
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।” (গীতাঞ্জলি, ৭২)

রবীন্দ্রনাথের রাজা আসেন দিনের আলোর সমারোহে নয়—গভীর অন্ধকার রাতে। ‘ডাকঘরে’ অমলের কাছে যখন রাজা আসবেন তখন ঘরের সব দীপ নিভিয়ে দেওয়া হয়, শুধু আকাশের তারা থেকে আলো আসে। ‘রাজা’ নাটকে রানি সুদর্শনার সঙ্গে রাজার দেখা হয় অন্ধকারে। যতদিন রানির চোখ শুধু সুন্দরকেই খুঁজেছিল ততদিন রাজা অন্ধকারেই ছিলেন। আর যেদিন রানি বুঝতে পারলেন বাইরের সৌন্দর্য নয়—অন্তরের সৌন্দর্যই আসল সৌন্দর্য, সেদিন আর অন্ধকারের আড়ালের প্রয়োজন থাকল না। এই অন্ধকারই রাজা আর রানির মিলনের সেতু। আবার ‘খেয়া’-র ‘আগমন’ কবিতায় রাজা আসেন গভীর রাতে। তাঁর প্রতীক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখন তিনি আসেন ঝড়, ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ সঙ্গে নিয়ে। তাই শূন্য হাতেই তাঁকে অভ্যর্থনা করতে হয় :

‘‘তখনো রাত আঁধার আছে,
বেজে উঠল ভেরী,
কে ফুকারে, ‘জাগো সবাই,
আর কোরো না দেরি।’...
কোথায় আলো, কোথায় মাল্য
কোথায় আয়োজন।
রাজা আমার দেশে এল
কোথায় সিংহাসন।
হায় রে ভাগ্য, হায় রে লজ্জা,
কোথায় সভা, কোথায় সজ্জা।
দু-এক জনে কহে কানে,
‘বৃথা এ ক্রন্দন—
রিক্ত করে শূন্য ঘরে
করো অভ্যর্থন।’ ”

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘‘অনন্তের রঙ তো শুভ্র নয়, তা কালো কিম্বা নীল। এই আকাশ খানিক দূর পর্যন্ত আকাশ অর্থাৎ প্রকাশ, ততটা সে সাদা। তার পরে সে অব্যক্ত, সেইখান থেকে সে নীল। আলো যতদূর সীমার রাজ্য সেই পর্যন্ত; তার পরেই অসীম অন্ধকার।” (জাপান-যাত্রী) এই অন্ধকারই চিরকাল মানুষকে আকর্ষণ করছে। তাই চেনা জগৎ ছেড়ে সে অজানা পথে বেরিয়ে পড়ে। সে-পথে যতই বিপদ থাকুক, যতই বাধা আসুক সে গ্রাহ্য করে না। আলোর রূপ বর্ণনা করা যায়। কিন্তু অন্ধকার বর্ণনাতীত। ব্রহ্মের মতোই, অন্ধকারকেও উচ্ছিষ্ট করা যায় না।

অন্ধকারে মানুষ ছুটে যায় কেন? ওই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বাঁশি তাকে ডাকে। কবির মতে ওই অন্ধকারের বাঁশি শুনেই মানুষ যুগে যুগে নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় ছুটে বেড়িয়েছে : ‘‘ঐ কালোকে দেখে মানুষ ভুলেছে। ঐ কালোর বাঁশিতেই মানুষকে উত্তরমেরু দক্ষিণমেরুতে টানে, অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণের রাস্তা বেয়ে মানুষের মন দুর্গমের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, বার বার মরতে মরতে সমুদ্রপারের পথ বের করে, বার বার মরতে মরতে আকাশপারের ডানা মেলতে থাকে।”

(জাপান-যাত্রী)

‘‘নিশায় নীরব দেবালয়ে তোমার আরাধন,

তখন মোরে আদেশ কোরো গাইতে হে রাজন।"
(পূজা, ২৩)

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন দিনের বেলা মানুষের আর রাতের বেলা দেবতার :

"কোনো একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলুম যে আমি নিশীথরাত্রির সভাকবি। আমার বরাবর এ কথাই মনে হয় যে, দিনের বেলাটা মর্তলোকের, আর রাত্রিবেলাটা সুরলোকের। মানুষ ভয় পায়, মানুষ কাজকর্ম করে, মানুষ তার পায়ের কাছের পথটা স্পষ্ট করে দেখতে চায়, এইজন্যে এতবড়ো একটা আলো জ্বালাতে হয়েছে। দেবতার ভয় নেই, দেবতার কাজ নিঃশব্দে গোপনে, দেবতার চলার সঙ্গে স্তব্ধতার কোনো বিরোধ নেই, এইজন্যেই অসীম অন্ধকার দেবসভার আস্তরণ। দেবতা রাত্রেই আমাদের বাতায়নে এসে দেখা দেন।" (জাপান-যাত্রী) সেজন্য বিজ্ঞান যখন তার আবিষ্কার দিয়ে রাতকে দিনের মতো আলোয় ভরিয়ে দিয়েছে, কবির ভাল লাগেনি। তাঁর মনে হয়েছে, "দিনটা মানুষের নিজের, তার মুখে সে কালি মাখালেও দেবতা তা নিয়ে নালিশ করবেন না। কিন্তু রাত্রির অখণ্ড অন্ধকারকে মানুষ যখন নিজের আলো দিয়ে ফুটো করে দেয় তখন দেবতার অধিকারে সে হস্তক্ষেপ করে।" (তদেব)

সেই অনধিকার চর্চা একান্তভাবে মানুষেরই। কালোর সঙ্গে আলোর কোনও বিরোধ নেই। অনন্ত যদি শূন্যই হতেন তাহলে জগৎ আনন্দময় হবে কী করে? জগতের যে-আনন্দযজ্ঞে কবির নিমন্ত্রণ সেখানে আলো আর অন্ধকারের সীমারেখা ঘুচে যায়। বন্ধনের মধ্যে যেমন মুক্তি সেইরকম শূন্যতার মধ্যেই পূর্ণতা। তাই আলো অন্ধকারের বুকে নেমে আসে আবার অন্ধকার মিলিয়ে যায় আলোর বুকে : "সেইজন্যই তো সৃষ্টির এই লীলা দেখছি, আলো এগিয়ে চলেছে অন্ধকারের অকূলে, অন্ধকার নেমে আসছে আলোর কূলে।" (তদেব) তাই তিনি অন্ধকারকে বন্দনা করে বলেন,

"উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার,
নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার।
প্রভাত-আলোকচ্ছটা শুভ্র তব আদিশঙ্খধ্বনি
চিত্তের কন্দরে মোর বেজেছিল, একদা যেমনি
নূতন চেয়েছি আঁখি তুলি...।"
(অন্ধকার, পূরবী)

উপনিষদ আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন "তমসো মা জ্যোতির্গময়।" অন্ধকারের মাঝেও আলোর আভা আছে। জাপানে বিখ্যাত শিল্পী শিমোমুরার একটি ছবি দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এক অন্ধ সূর্যকে বন্দনা করছে। সেই ছবি দেখে তাঁর মনে হয়েছিল উপনিষদের এই বাণীর রূপ যেন তিনি এতদিন পরে দেখতে পেলেন :

"শীতের পরে প্রথম বসন্ত এসেছে; প্লাম গাছের ডালে একটাও পাতা নেই, সাদা সাদা ফুল ধরেছে, ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ছে; বৃহৎ পর্দার এক প্রান্তে দিগন্তের কাছে রক্তবর্ণ সূর্য দেখা দিয়েছে, পর্দার অপর প্রান্তে প্লাম গাছের রিক্ত ডালের আড়ালে দেখা যাচ্ছে একটি অন্ধ হাতজোড় করে সূর্যের বন্দনায় রত। একটি অন্ধ, এক গাছ, এক সূর্য, আর সোনায়-ঢালা এক সুবৃহৎ আকাশ; এমন ছবি আমি কখনো দেখি নি। উপনিষদের সেই প্রার্থনাবাণী যেন রূপ ধরে আমার কাছে দেখা দিলে—তমসো মা জ্যোতির্গময়। কেবল অন্ধ মানুষের নয়, অন্ধ প্রকৃতির এই প্রার্থনা, তমসো মা জ্যোতির্গময়—সেই প্লাম গাছের একাগ্র প্রসারিত শাখাপ্রশাখার ভিতর দিয়ে জ্যোতির্লোকের দিকে উঠছে। অথচ, আলোয় আলোময়—তারই মাঝখানে অন্ধের প্রার্থনা।" (জাপান-যাত্রী)

এ-ছবিতে অন্ধ মানুষ অন্ধ প্রকৃতির প্রতীক। ইন্দ্রিয়ের সীমার বাইরে যা আছে তাকে যখন আমরা অনুভব করতে পারি তখন আলো আর অন্ধকারের সীমারেখা হারিয়ে যায়। কবি যাঁকে চান তিনি তো

শুধু আলোর মধ্যেই বিরাজ করেন না, অন্ধকারের মাঝেও তিনি আছেন। তাঁর অন্ধকার অসীম তাঁর আলোর মতো। কবি তাই প্রার্থনা করছেন তাঁর মনের অন্ধকার, তাঁর জীবনদেবতার সেই অতল অন্ধকারে নিঃশেষে ডুবে যাক। তাই তিনি তাঁর 'আমি'কে; তাঁর নিজস্ব সত্তাকে বিসর্জন দিতে চান। সেই অন্ধকারে তাঁর 'আমি'র মৃত্যু হোক :

''এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী!
এসো নিবিড়, এসো গভীর, এসো জীবনপারে,
আমার চিত্তে এসো নামি।
এ দেহমন মিলায়ে যাক, হইয়া যাক হারা...।''
(রাজা)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দিন ও রাত্রি' প্রবন্ধে বলেছেন, অন্ধকার না থাকলে আলোর কাছে আমরা বন্দি হয়ে থাকতাম। রাতই আমাদের প্রতিদিনের জীবনের গ্লানি থেকে মুক্তি দেয়। সে-ই প্রভুর সঙ্গে মিলন করিয়ে দেয় আমাদের : ''দিন আমাদিগকে যাহা দেয়, রাত্রি শুদ্ধমাত্র যে তাহা অপহরণ করে, তাহা নহে—অন্ধকার যে কেবলমাত্র অভাব ও শূন্যতা আনয়ন করে, তাহা নহে—তাহারও দিবার জিনিস আছে এবং যাহা দেয়, তাহা মহামূল্য। সে যে কেবল সুপ্তির দ্বারা আমাদের ক্ষতিপূরণ করে—আমাদের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া দেয় মাত্র, তাহা নহে। সে আমাদের প্রেমের নিভৃত নির্ভরস্থান; সে আমাদের মিলনের মহাদেশ।''

দিনের শেষে কর্মক্লান্ত রিক্ত কবি আসন্ন অন্ধকারের কাছেই নূতন প্রাণ ভিক্ষা চাইছেন। এই অন্ধকার ভয়ানক নয়, এ আমাদের অস্তিত্বকে গ্রাস করে না। এই অন্ধকার নতুন করে বাঁচতে শেখায়, নতুন করে আলোর পিপাসা জাগিয়ে তোলে। অপরাহ্নের ম্লান আলোর মাঝে আগামী দিনের সোনালি সকালের প্রতিশ্রুতি কবির চোখে পড়ে :

''আজি মোর ক্লান্তি ঘেরি দিবসের অন্তিম প্রহর
গোধূলির ছায়ায় ধূসর।
হে গম্ভীর, আসিয়াছি তোমার সোনার সিংহদ্বারে
যেখানে দিনান্তরবি আপন চরম নমস্কারে
তোমার চরণে নত হল।
যেথা রিক্ত নিঃস্ব দিবা প্রাচীন ভিক্ষুর জীর্ণবেশে
নূতন প্রাণের লাগি তোমার প্রাঙ্গণতলে এসে
বলে দ্বার খোলো।''
(অন্ধকার, পূরবী)

দিনের আলোতে কবি যা পাননি, অন্ধকারে তা পাবেন—এই তাঁর আশা। যা আমরা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করি তার বাইরেও কিছু থাকে যা ইন্দ্রিয়াতীত। আলোর ঝরনাধারায় যাকে পাওয়া যায় না, অন্ধকারে তাকে পাওয়া যায়। কবি অন্ধকারের আলোর ঐশ্বর্য থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিতে চান। তিনি সেখানে যেতে চান যেখানে চারদিক নিস্তব্ধ কিন্তু সেই নিস্তব্ধতার মধ্যেই শোনা যায় তাঁর সংগীত বিশ্বের কণ্ঠ থেকে। সেই সংগীতের স্রোত চিরকাল এই বিশ্বচরাচরের ওপরে বয়ে চলেছে। শুধু আলো নয়, সংগীতের উৎসও অন্ধকারের গর্ভে :

''দৃষ্টির সম্মুখে মম এইবার নির্বারিত হোক
আঁধারের আলোকভাণ্ডার।
নিয়ে যাও সেইখানে নিঃশব্দের গূঢ় গুহা হতে
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে
সংগীত তোমার।'' (তদেব)

আবার দিনের আলোয় নয়, রাতের অন্ধকারেই কোনও অজানা শিল্পী কবির বীণায় সুরের ঝংকার তোলেন। কবি অবাক হয়ে ভাবেন তাঁর হাতেও তো তাঁর বীণা এমন করে কখনও বাজেনি! কিন্তু তিনি কবির কাছে অধরাই থেকে যান। তাঁকে না পাওয়ার যন্ত্রণায় কবি অধীর। যে-সুর তিনি শুনতে পাচ্ছেন সেই সুরের ব্যাকুলতা তাঁকে স্পর্শ করছে, অথচ তার মধ্যে যে কি বাণী লুকিয়ে আছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। সে-সুর যিনি বাজাচ্ছেন তাঁকে কবি কাছে পেতে চান কিন্তু সেই অজানা

শিল্পীর দেখা তিনি পান না। শুধু সুর শুনতে পান :

''বিশ্ব যখন নিদ্রামগন,
গগন অন্ধকার;
কে দেয় আমার বীণার তারে
এমন ঝংকার।
নয়নে ঘুম নিল কেড়ে,
উঠে বসি শয়ন ছেড়ে,
মেলে আঁখি চেয়ে থাকি
পাইনে দেখা তার।
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া
প্রাণ উঠিল পূরে,
জানিনে কোন্ বিপুল বাণী
বাজে ব্যাকুল সুরে।'' (গীতাঞ্জলি, ৬০)

আবার আর এক অন্ধকারের কথাও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। সে-অন্ধকার মানুষের সৃষ্টি। সে এক ভয়ানক অন্ধকার। মৃত রাক্ষসের চোখের মতো সে যেমন বীভৎস তেমনই ভয়ানক। সেই অন্ধকার রাত কখন শেষ হবে কেউ জানে না :

''রাত কত হল?
উত্তর মেলে না।
কেননা, অন্ধ কাল যুগ-যুগান্তরের গোলকধাঁধায় ঘোরে, পথ অজানা,
পথের শেষ কোথায় খেয়াল নেই।
পাহাড়তলিতে অন্ধকার মৃত রাক্ষসের
চক্ষুকোটরের মত...।'' (শিশুতীর্থ, পুনশ্চ)

সেই অন্ধকারে দিশাহারা সব মানুষ 'ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো' ঘুরে বেড়ায়। তাদের নেতাকেও তারা বিশ্বাস করে না। তাকে মিথ্যাবাদী বলে, প্রতারক বলে। তারপরে একজন তাকে আঘাত করে, তারপরে আরও একজন, তারপরে আরও একজন। অবশেষে তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আর কি আশ্চর্য তখনই বাতাসে জুঁই ফুলের গন্ধ ভেসে আসে :

''জনতার মধ্য থেকে কে-একজন হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে
অধিনেতার দিকে আঙুল তুলে বললে,
মিথ্যাবাদী আমাদের প্রবঞ্চনা করেছ।
ভর্ৎসনা এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠে উদগ্র হতে থাকল।
তীব্র হল মেয়েদের বিদ্বেষ, প্রবল হল পুরুষদের তর্জন।
অবশেষে এক সাহসিক উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ
তাকে মারলে প্রচণ্ড বেগে।
অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না।
একজনের পর একজন উঠল, আঘাতের পর আঘাত করলে,
তার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।
রাত্রি নিস্তব্ধ।
ঝর্নার কলশব্দ দূর থেকে ক্ষীণ হয়ে আসছে।
বাতাসে যূথীর মৃদুগন্ধ।'' (তদেব)

এই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ মানুষের ওপরে বিশ্বাস হারান না। তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের মধ্যে যে-পশু আছে তাকে একদিন হার মানতেই হবে। অন্ধকার একদিন শেষ হয়ে যাবে, আবার নতুন দিনের আলো আসবে। সেই আলোয় ভরা আকাশের নিচে মা বসুন্ধরা তাঁর নবজাত শিশুকে কোলে নিয়ে দেখা দেবেন। সেই শিশুই মানুষকে এই অন্ধকার থেকে আবার আলোয় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আকাশ, বাতাস তার জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠবে :

''মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
উষার কোলে যেন শুকতারা।
দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝংকার,
গান উঠল আকাশে—
জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের,
ওই চিরজীবিতের।'' (তদেব)

মনে পড়ে

লোকোত্তর পুরুষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

মিতা মজুমদার

মা তাঁর সন্তানের স্মৃতিকথা লিখেছেন, এমন দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই। সেদিক থেকে এই স্মৃতিকথাটি হয়তো একটু ব্যতিক্রম। বয়সে প্রায় আমার দ্বিগুণ হলেও স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ আমাকে 'মা' বলতেন। সাধুসন্তরা যেকোনও নারীকেই, এমনকী শিশুকন্যাকেও মাতৃসম্বোধন করেন। কিন্তু মহারাজ আমাকে সত্যিকারের মা-ই মনে করতেন। তিনি বারবার বলেছেন, আমি যেন তাঁর কথায় অবিশ্বাস না করি। তাই ধীরে ধীরে তাঁর ওই ডাক খুব সহজ হয়ে এসেছিল এবং আমিও তাঁকে সন্তানের মতোই দেখতাম। কখনও 'বাবা', কখনও 'গোপাল' বলে তাঁকে ডাকতাম।

মাঝে মাঝে এমন এক-একজন মানুষ আমাদের মধ্যে আসেন, যাঁকে দেখে ঠিক বুঝে উঠতে পারা যায় না ইনি মানুষ না দেবতা! তাঁর আচার-ব্যবহার, চিন্তাভাবনা কোনওকিছুই আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলে না। এই জগতে থেকেও তিনি যেন জগতছাড়া এক ব্যক্তিত্ব। জগতছাড়া, কারণ যে-আমিত্ববোধ এই জগৎ-সংসারকে চালাচ্ছে সেটি, অর্থাৎ সেই কাঁচা-আমিটি তাঁর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর আমিটি যেন ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। ঈশ্বরময় হয়ে, তাঁর হাতের যন্ত্র হয়ে তিনি চলাফেরা, কাজকর্ম—সব করছেন। এমনই এক লোকোত্তর পুরুষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

তিনি প্রায়ই বলতেন, ''God is man at his best।'' বাস্তবিক, মানুষ যে কত সুন্দর, মহান, পবিত্র, নিঃস্বার্থ, নিরভিমান, সর্বোপরি কতবড় প্রেমিক হতে পারে, মহারাজ ছিলেন তার মূর্ত প্রতীক। দেবত্ব আর মানবত্বের মাঝে, শিবলোক আর জীবলোকের মাঝে একটি অতি সূক্ষ্ম অথচ দৃশ্যমান সেতুর মতো যেন তিনি বিরাজ করতেন। মানুষকে তাঁর অপার্থিব, অকৃপণ ভালবাসায় ভরপুর করে দিয়ে তাদের মধ্যে ঈশ্বর হওয়ার স্বপ্ন জাগিয়ে দিতেন; এবং সেই পরম লক্ষ্যের পথে সর্বশক্তি দিয়ে এগিয়ে দিতেন। মানুষ স্বরূপত শুদ্ধ, বুদ্ধ, পূর্ণ—নিজে এই বোধে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলেই সাধু, গৃহী, বিদ্বান, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র সকলের প্রতি তাঁর ছিল শ্রদ্ধাপূর্ণ ভালবাসা ও বিশ্বাস। সেই ভালবাসা এমন ছিল যার কাছে জাগতিক সব ভালবাসাই ম্লান

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখিকা

হয়ে যেত। তাই তাঁর ওই সুবিশাল ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়েও কারও নিজেকে ছোট বা হীন মনে হত না। বরং আত্মবিশ্বাস জেগে উঠত, নিজেকে আরও ভাল করে গড়ে তোলার সংকল্প জেগে উঠত। মহারাজ বলতেন, ''সর্বদা মানুষের গুণ দেখার চেষ্টা করবে। কারও দোষ দেখবে না। মানুষের মধ্যে সেই পরমাত্মা বিরাজ করছেন। তাই মানুষ যখন ভুল করে, জানবে সেটা একটা accident, দুর্ঘটনা। একজন মনে করো অনেক উঁচুতে উঠেছে, হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল—তার মানে কি সে যে-উচ্চতায় উঠেছিল সেটা মিথ্যা হয়ে গেল? কখনই না। তাই মানুষের স্বরূপ দেখার চেষ্টা করবে। ভুল করুক, যা করুক—দেখবে না।''

একদিন মহারাজ সরলভাবে বলছেন, ''আমেরিকার এক ব্রহ্মচারী আমাকে খুব ভালবাসত। বলত, 'You are an embodiment of love।' একবার সে-ই আমাকে বলল, 'একটি ছেলের এইড্‌স হয়েছে... আপনি যদি ওকে একটা চিঠি লেখেন।' লিখলাম। সে উত্তরও দিল। দু-তিনটে চিঠি দিয়েছিলাম। ছেলেটি মারা গেছে। কিন্তু তার পরিচিতরা বলেছেন, আগে ছেলেটি মৃত্যুভয়ে কাঁদত। কিন্তু মারা যাওয়ার আগে সে খুব সাহসী হয়ে উঠেছিল। হাসত, সবসময় আনন্দ করত। বলত, 'কে মরে? আমার কোনও ভয় নেই।' জানো, আমার একটা ছবি সে মাথার কাছে রেখেছিল!''

মহারাজের ভালবাসা আর আশীর্বাদ সূর্যকিরণের মতো সকলের ওপর সমানভাবে বর্ষিত হত। মনের মধ্যে কত ঘটনাই না ভিড় করে আসছে।

দক্ষিণ বারাসাতে 'সুন্দরী' নামে এক ধর্মপ্রাণ বালবিধবা রাঁধুনির কাজ করে কায়ক্লেশে দিন কাটাতেন। বয়স বেড়ে গেলে তাঁর আর কাজ করার ক্ষমতা রইল না। এক ভক্তমহিলা মাঝে মাঝে তাঁকে কিছু সাহায্য করতেন। তাতেই কোনওমতে বৃদ্ধার দিন চলত। ওই ভক্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের মন্দিরে রোজ তিনি 'কথামৃত' পড়তেন। বৃদ্ধার শারীরিক ও আর্থিক কষ্টে বিচলিত হয়ে সেই ভক্ত তাঁকে একদিন মহারাজের কাছে নিয়ে এলেন। সমাজের চোখে আজীবন হেয়, তুচ্ছ, অবহেলিত মানুষটিকে মহারাজ কত যে যত্ন করলেন, ভালবাসা ও সম্মান দিলেন, তা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বৃদ্ধা মহারাজের জন্য সামান্য খাবার তৈরি করে এনেছিলেন। মহারাজ তা মাথায় ঠেকিয়ে গ্রহণ করলেন। সেই ভালবাসার ছোঁয়ায় মানুষটি সেদিন যেন নতুন মানুষ হয়ে তাঁর পর্ণকুটিরে ফিরে গেলেন। মহারাজ তাঁকে একদিন (২৮ এপ্রিল ১৯৯৫) একটি চিঠি লিখলেন :

স্নেহের সুন্দরী,

তোমার ভিতর ও বাহির দুইই সুন্দর, তাই তুমি 'সুন্দরী'। তুমি এই সুন্দরই থাকো এবং শেষদিনে ঈশ্বর যিনি সুন্দরতম, তাঁর সঙ্গে মিশে যাও—এই আমার প্রার্থনা।

ইতি
শুভাকাঙ্ক্ষী
লোকেশ্বরানন্দ

অল্প কিছুদিন পরে বৃদ্ধার শরীর যায়। শেষের দিনগুলিতে তিনি একমনে ঠাকুর-মাকে ডাকতেন আর মহারাজের পরম আশীর্বাদের কথা ভেবে আনন্দে ভাসতেন। দেহ যাওয়ার সময় দেখা গেল মহারাজের একটি ছবি তাঁর শিয়রে রাখা।

মহারাজ প্রায়ই বলতেন, ''ভালবাসার চাইতে বড় আর কিছু নেই। সবাইকে ভালবাসবে। সেবা কীভাবে করবে? কোনও দুঃখী লোক যদি বলে, 'পৃথিবীতে আমার কেউ নেই,' তুমি বলবে, 'জেনে রাখো, পৃথিবীতে তোমার একজন আছে। আমি আছি তোমার। হয়তো তোমায় অনেক অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারব না, কিন্তু তোমার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব।' সমাজে সবাই যাকে ঘৃণ্য বলে, সেও যদি কখনও তোমার কাছে আসে,

তাকে কিন্তু ঘৃণা করবে না। সবাইকে আনন্দ দেবে, সবাইকে ভালবাসা দেবে, শান্তি দেবে। আমাদের ওই তো কাজ। অকৃত্রিম সহানুভূতি, ভালবাসা—পৃথিবীতে এরই অভাব। আত্মীয়স্বজনের কাছেও এসব পাওয়া যায় না।"

তারপর একটি চরম কথা বললেন, "শোনো, সর্বভূতে ভালবাসা চাই। হৃদয়টা ভালবাসায় ভরিয়ে ফেলো। সকলের মধ্যেই ঠাকুর আছেন এই জ্ঞানে সকলকে খুব ভালবাসো। কোনও বিভেদ যেন না থাকে। এতটুকু বেশি-কম যেন না হয়। দেখবে এভাবেই ধীরে ধীরে পরমজ্ঞানে পৌঁছবে। কোনও বিচার কোরো না। আমরা কাউকে ঘৃণা করব না, মনে থাকে যেন।"

একদিন সর্বভূতে ইষ্টদর্শনের কথা হচ্ছে। মহারাজ বললেন, "এ practise করতে হয়। দেখো, ঠাকুর পুজো করছেন। ঘরে বিড়াল ঢুকেছে। বলছেন, 'ও মা, তুই এইরূপে এসেছিস! নে খা।' মানুষ যতই খারাপ ব্যবহার করুক, আঘাত দিক, মনে করবে—'ও ঠাকুর, তুমি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে আনন্দ পাচ্ছ? আচ্ছা।' "

এই হল তাঁর অতুলনীয় নিষ্কাম ভালবাসারূপ পূজা। জীবনভোর তিনি জীবরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে এই ভালবাসার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে গেছেন। আপন হৃদয়ের আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন অসংখ্য মানুষের হৃদয়। ভাগ্যবান সেইসব মানুষ অনুভব করেছেন, আজও করছেন, ধীরে ধীরে তাঁদের হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হচ্ছে।

মহারাজ বলতেন, "জীবনটা একটা শিল্প। একজন শিল্পী বিশাল এক পাথর নিয়ে, ছেনি আর বাটালির সাহায্যে মাসের পর মাস ঠুক ঠুক করে কাজ করে চলেন। কাজ শেষ হলে দেখা যায় আগের পাথর আর নেই। তার জায়গায় অপূর্ব সুন্দর এক বুদ্ধমূর্তি! বুদ্ধমূর্তির সম্ভাবনা ওই পাথরের মধ্যেই ছিল। শিল্পী প্রথমে তাঁর মনে ওই ছবিটি এঁকে তারপর তার অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি বাদ দিয়ে সেই সম্ভাবনাটি রূপায়িত করেন। ঠিক সেইরকম, একটি আদর্শকে জীবনে বরণ করে, তিল তিল করে তাকে রূপায়িত করতে হবে।"

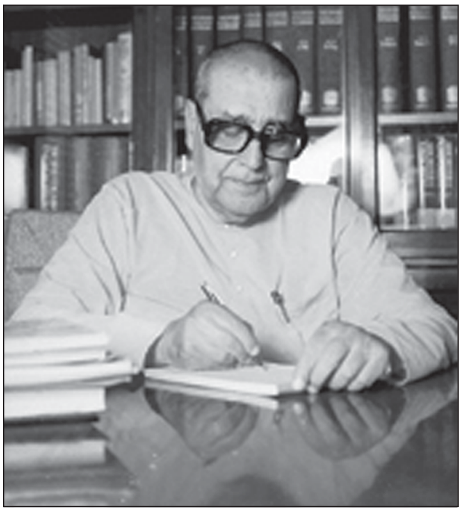
আবার বড় সুন্দর করে বলতেন, "ধর্ম একটা commitment (অঙ্গীকার); একটা আদর্শকে সামনে রেখে সেই আদর্শস্বরূপ হওয়া। ধর্ম মানুষকে গড়ে, তার রূপান্তর ঘটায়। ধর্ম একটা বিজ্ঞান। অন্তর্জগতের বিজ্ঞান। পূজা-অর্চনা, ব্রত, উপবাস এসব ধর্মের গৌণ দিক বা বহিরঙ্গ; ধর্মের মুখ্য দিক অন্তরঙ্গ দিক হল সত্যনিষ্ঠা, প্রেম, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থতা এসব গুণ আয়ত্ত করা। তবে, গাছের পাকা ফল এ নয়। ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে এগোতে হবে। ধর্ম মানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলা; রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত হওয়া; নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করা। জানো, আমার কত রাত চোখের জলে বালিশ ভিজেছে!" বলতেন, "মন একেবারে চড়া সুরে বাঁধা থাকবে। যদি কখনও একটু নামে তখন শাস্ত্রপাঠ, শাস্ত্রচর্চা নিয়ে জীবন কাটাবে, আর খুব ঠাকুরের কাজ করবে।"

মহারাজের শেখানোর কৌশলটি ছিল অসাধারণ। মানুষের চরিত্রের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা দেখলে তিনি শুধু দু-চারটি কথা বলে তার মনটিকে এমন উঁচু সুরে বেঁধে দিতেন যে সংকীর্ণ ভাব আপনা থেকেই চলে যেত। একদিন এক ভদ্রলোক দুঃখে মুহ্যমান হয়ে মহারাজের কাছে এসে বলছেন, "বাড়িতে এত অশান্তি চলছে, এত খারাপ ব্যবহার করছে যে তিনদিন জপ পর্যন্ত করতে পারছি না।" মহারাজ বললেন, "শুনুন, যার ভিতরে দুঃখ আছে, জ্বালা আছে, সেই অন্যকে দুঃখ দেয়। কিন্তু আপনার ভিতরে তো স্নেহ আছে, সহানুভূতি আছে, আনন্দ আছে, আপনি সবাইকে তাই দিন।"

একদিন বলছেন, "অনেকের স্বভাব আছে সাপের মতো তেড়ে এসে কামড়ায়। তাকে কিন্তু

উলটে আঘাত করবে না। জানবে তার মনের মধ্যে ক্ষত আছে। আমরা বাইরের ক্ষত দেখতে পাই, তাতে ওষুধ দিই। কিন্তু ভিতরের ক্ষত দেখতে পাই না। তাই, যে এরকম ব্যবহার করবে তাকে ভালবাসার মলম দেবে।”

একবার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর এক কর্মীকে তার অন্যায় আচরণের জন্য সম্ভবত বরখাস্ত করা হয়েছে, কারণ বারবার সংশোধনের সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও সে শোধরায়নি। আবার তার প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সে প্রাপ্তিস্বীকার না করে ফের টাকা দাবি করেছে। ইনস্টিটিউটের তৎকালীন রেজিস্ট্রার অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে মহারাজকে বিষয়টি জানাতেই মহারাজ শান্তভাবে বললেন, ‘‘আচ্ছা দেখি কী করা যায়।” রেজিস্ট্রার চলে যেতেই উপস্থিত এক ভক্ত বলল, ‘‘কী হবে মহারাজ?” মহারাজ হাত জোড় করে চোখ বন্ধ করে বললেন, ‘‘ওর জন্য প্রার্থনা করো। বলো, ঠাকুর ওর সুমতি দাও।” বলছেন আর চশমার ফাঁক দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে! সেই ক্ষমাসুন্দর রূপটি চিরতরে মানসপটে আঁকা হয়ে গেল।



কখনও কারও নিন্দা বা সমালোচনা করতেন না মহারাজ। আবার নিন্দা শুনতেনও না। একদিন ওঁর অফিসঘরে এক বিশেষ জনজাতির মানুষের কথা বলতে গিয়ে মহারাজ বলছেন যে, ‘‘ওরা মাটির হাঁড়ির মধ্যে কাঁচা মাছ পুরে সেটা মাটির তলায় পুঁতে রাখে। মাস কয়েক পরে সেটা যখন তোলা হয় তখন সেসব মাছ পচে গলে যায়, পোকা কিলবিল করে। খুব সম্মাননীয় অতিথিকে নিমন্ত্রণ করলে ওই জিনিসটি ছেঁকে তার তরল রস একটু তাঁকে পরিবেশন করে, নিজেরাও নেয়। তা, আমাকেও ওরা একবার খাবারের সঙ্গে ওই জিনিসটি দিয়েছিল।” ওইকথা শুনে উপস্থিত এক ভক্ত ঘৃণা প্রকাশ করতেই গর্জে উঠলেন মহারাজ। বললেন, ‘‘না, কখনও এরকম বলতে পার না। তুমি যদি ওদের মধ্যে জন্মাতে, তাহলে ওটাই তোমার স্বাভাবিক মনে হত। একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি তোমাদের। আমি তখন চেরাপুঞ্জিতে। কলকাতার কাজ সেরে ফেরার সময় মনে হল ছেলেদের ভাল কিছু খাওয়াতে পারি না। তা, তখন কে সি দাশের রসমালাই নতুন উঠেছে। টিকিটের পয়সা রেখে বাকি টাকা দিয়ে ওদের জন্য রসমালাই কিনে নিয়ে মহানন্দে ফিরেছি। রাতে সবাইকে রসমালাই দেওয়া হল। ভোরবেলা উঠে প্রতিদিনের মতো স্কুল কম্পাউন্ডের চারদিকে ঘুরতে গিয়ে আবছা অন্ধকারে এক জায়গায় সাদা ছোট একটা ঢিপি চোখে পড়ল। কাছে গিয়ে দেখি রসমালাই! কী ব্যাপার! ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেল দু-চারজন ওই ‘বিশ্রী’ জিনিস খেয়ে বমি করে ফেলেছে। তাই দেখে অন্যান্য ছাত্ররা তাদের ভাগের রসমালাইগুলো লুকিয়ে ফেলে এসেছে।”

আর একটা ঘটনাও এই প্রসঙ্গে বললেন, ‘‘জেডুবা দ্বীপে রিলিফ করতে গেছি। যে-বাড়িতে ছিলাম তাদের লুচি খাওয়াতে ইচ্ছা হল। দেওঘর থেকে তাই খাঁটি ঘি আনিয়েছি। কিন্তু সেই ঘিয়ে

লুচি ভাজতে গিয়ে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড বাধল। গৃহকর্তা হঠাৎ মারমুখী হয়ে এসে বললেন, 'আমার মেয়েকে আপনারা মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছেন! কী রান্না করছেন, যার উৎকট গন্ধে আমার মেয়ে সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে, আমাদেরও প্রাণ ওষ্ঠাগত?' আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। ওষুধপত্রও দেওয়া হল। তখন সে-মেয়ে সুস্থ হয়।" এইভাবে অন্যের আচার-আচরণকে, পছন্দ-অপছন্দকে নিরপেক্ষভাবে, ভালবাসা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শেখাতেন মহারাজ।

মহারাজের মধ্যে নেতিবাচক কিছু ছিল না। একদিন এক অধ্যাপিকা সমাজের দুরবস্থার কথা বলে দুঃখ করছেন : ''চারদিকে একটাও ভাল মানুষ আজ আর চোখে পড়ে না মহারাজ।" মহারাজ মৌন থেকে তাঁকে যতই নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছেন, ভদ্রমহিলা ততই উত্তেজিত হয়ে তাঁর নিজের সিদ্ধান্তটি আবৃত্তি করতে থাকলেন। শেষে মহারাজ গম্ভীরস্বরে বললেন, ''তোমার দুর্ভাগ্য যে তোমার চারপাশে দেবতার মতো যেসব মানুষ আছেন, তুমি তাঁদের দেখতে পাও না।" সবাই স্তব্ধ!

মহারাজ বলতেন, ''আজকালকার ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি কত ভাল তারা! আমরা তাদের প্রাণশক্তিকে ঠিকপথে চালাতে পারি না।" একদিন বলছেন, ''সবার মুখে আজকাল এক কথা—মানুষ যেন পশুর স্তরে নেমে যাচ্ছে। কিন্তু সবাই কি নেমে যাচ্ছে? সমাজে শতকরা কজন লোক খারাপ? সবাইকে পাপী মনে করাই পাপ। যদি সবাই সত্যিই খারাপ হয়, তাহলে তাদের নিন্দা করেই কি আমরা ক্ষান্ত থাকব? আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই? অন্ধকারকে দূর করব আলো দিয়ে। মন্দকে মুছে দেব ভাল দিয়ে।"

মহারাজ বলতেন, ''ভালকে ভাল বলতে হয়, তাতে নিজের গৌরব কিছু ক্ষুণ্ণ হয় না। যে ভাল তার গুণ স্বীকার করব না?" আবার বলতেন, ''কখনও নিরাশ হতে নেই। তাহলে ঠাকুরের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। নিজেকে মনে করবে শুদ্ধ, পবিত্র, অপাপবিদ্ধ—শিশুর মতো ঠাকুরের পায়ের কাছে বসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছ।" এইভাবে প্রত্যেকের জীবনের সুরটি তিনি ঠাকুরের সঙ্গে বেঁধে দিতেন।

কথাশিল্পী ছিলেন মহারাজ। তাঁর কথার জাদুতে ও শক্তিতে জীবনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য আমাদের মতো সাধারণ মানুষেরও প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠত। তাঁর বাচনিক মাধুর্য একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। বড় নরম করে, ভালবেসে কথা বলে সকলের মন জয় করে নিতেন। বলতেন, ''চরৈবেতি, চরৈবেতি, চরৈবেতি—চলো, চলো, চলো। থেমে যেয়ো না। থেমে যাওয়ার নাম মৃত্যু। Be and make।" বলতেন, ''ইষ্ট আর কী? ইষ্ট একটা ছাঁচ। ওই ছাঁচে নিজেকে ঢালতে হয়। জ্ঞানের আলো মনের ভিতর জ্বালতে হয়। প্রতিটি দিনই আমার জন্মদিন। নতুন সূর্য। পরিবেশ পরিবেশ করে চেঁচালে হয় না। নিজে নমনীয়, শান্ত, সহিষ্ণু হতে হয়। একটু মাথা নিচু করতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'শ, ষ, স।' শুধু 'আমার আমার' করতে নেই। তিল তিল করে নিজেকে গড়তে হয়।"

এই প্রসঙ্গেই আর একদিন বলেছিলেন, ''পরিবেশ পরিবেশ করে আক্ষেপ করলে হবে না। পরিবেশ তো আমাদের মনের অজ্ঞানতার সৃষ্টি। আত্মজ্ঞান হলে সংসারকে আর সংসার বলে বোধ হয় না। তখন জ্ঞানী সর্বত্র আত্মদর্শন করে আনন্দে ভরপুর হয়ে যান। তাই বুঝতে হবে সবকিছু এই মনে। সংসার মনে। তাই মনটাকে বদলে ফেলতে হয়। চেষ্টা করলেই তা পারা যায়। যুগযুগান্তর ধরে মহাপুরুষরা বদলে ফেলেছেন। গুরু সেই পথ বলে দেন, যে-পথে গিয়ে মানুষ নিজেকে বদলে ফেলে অজ্ঞানতার বিনাশ ঘটাতে পারে। শাস্ত্রে সে-পথের কথা সব বলে দেওয়া আছে।" *ক্রমশ*

কবিতাবলি

তিনি না এলে

সিধিরাজ ঘোষ

'মনে করো
স্বামীজী যদি সে সময়ে
লন্ডনে না আসতেন
জীবনটা তাহলে নিরর্থক হয়ে যেত।'

আর নিবেদিতা যদি ভারতে না আসতেন

হররোজ আহ্নিক গতি
আস্ত দিনকে গিলে নেয়
রাত্রির ভীষণ অন্ধকারের পর
আরক্ত গেরুয়া সূর্য ওঠে
শিব আর বুদ্ধের দেশে
একটি গাছের ছায়ায় হাঁটু গেড়ে বসি।
অদূরে বিদ্যাপীঠ, দেখি
এক আন্দোলনের স্বপ্নারম্ভ।
এই তো নারীশিক্ষার উষা, কন্যামুক্তির আলো।
ব্যর্থতার চিহ্ন আর অন্ধত্বের শৃঙ্খল হাতড়ে
জাতির অভ্যুদয় কে রোধ করবে
দেশীয় সেবাবিপ্লবে
তিনি তো আমাদের মেয়ে।

গাছটির বয়স বাড়ছে,
বীজটি রোপিত হয়েছিল অর্ধপরিচিত,
অর্ধালোকিত এক অপ্রশস্ত ঠিকানায়
দেখলাম গাছটি বোধিবৃক্ষ হয়ে গেছে।

প্রোজ্জ্বল প্রাণের প্রদীপ

সোমনাথ সরকার

আর রঘুকুল, যদুকুল, কুরুপাণ্ডবের কুলুজি নেই,
রামকৃষ্ণ, তোমার সমাধির উৎসমুখ,
কখনও গঙ্গোত্রী, কখনও যমুনোত্রী হয়ে,
নামিয়ে দেয় জ্ঞানগঙ্গা, প্রেমযমুনা।
ইহকাল, পরকাল, দুকূল ছাপিয়ে,
অস্পৃশ্যতা, সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাত
ভাসিয়ে নিয়ে ফেলে মহাবোধিসাগরে;
আধ্যাত্মিকতার উর্বর পলি ফেলে যায়
আমাদের চলমান জীবনক্ষেত্রে।

কথামৃত গীতা না পঞ্চম বেদ,
এইসব কূট তর্ক করুক মহানন্দে তার্কিকেরা;
আমরা শুধু অভাবের সংসারে,
লাভের অভাবিত অযাচিত মুখ
দেখতে থাকি নেড়ে চেড়ে।

সঙ্গীসাথিরা পুষ্ট করেছে লীলা,
আমরা না থাকলেও বাদ পড়িনি;
অনেক সৌভাগ্যক্রমে বিনা শ্রমেই,
উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে চলেছি,
এক অনন্য সাধনার নিত্য প্রবহমান ভাবধারা।

তা গীতা থেকে বয়ে আজ মধুর সংগীতা,
এক অকাট্য জীবনসংহিতা।
আকাশের চাঁদ মাটিতে নেমে এসেছে,
প্রাণের প্রদীপ হয়ে তুমি,
আলো ধরছ কথামৃতের পাতায় পাতায়।

আলোকদিশারি

অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়

অন্ধকারের নিরেট পাহাড়টাকে জরিয়ে
দৈবী আলোর মতো এক
চেতনার অভিঘাত জাগে,
লক্ষ্যহীন, ত্রস্ত আবিলতাকে
সংহার করে

ভয়ভাঙানিয়া সে এক ঋজু বাতিঘর—
সিন্ধু নাবিকের দৃপ্ত বুকে
জাগায় উদ্দীপক প্রবল জোয়ার,
এক ঐশী বারতার সর্ব বরাভয় মন্ত্র।

ধ্বস্ত নুয়ে পড়া মনের দিকে তাকিয়ে
হঠাৎই যেন
হাজার ভুলভ্রান্তির মাঝখানে—
দিশাহীন জীবনবৃন্তে
জ্বলে ওঠে আলোকসরণি।

কূলহীন অসীম পাথারে মৃত্যুঞ্জয় আলো,
নিভৃত দেয়ালগিরিতে আজও জ্বলে সাহস
অনির্বাণ অন্বেষার চির সত্যের ধ্রুবালোক।

পুনর্জন্ম

জবা চট্টোপাধ্যায়

সবকিছু শেষ হয়েও
রয়ে যায় বাকি
কিছু কথা কিছু ব্যথা
গোপনেতে থাকি।
বাসনার আঁশটুকু
যদি রয়ে যায়
জন্মের ঘূর্ণিপাকে
ফিরে ফিরে আয়।

গোধূলির সংগমে

রঞ্জু মুখার্জি

এ আশ্চর্য এক সংগম।
সূর্যদেব পাটে যাবেন।
বিদায়বেলার রাঙা আলোময়
সমুদ্রের জলরাশি।
পবিত্র জলে হবে তাঁর অবগাহন।
দুগ্ধফেননিভ জলে কে যেন
আগুনরাঙা আবির ঢেলে দিয়েছে।
সমুদ্রস্নাত আলোক বালুকণায় প্রতিফলিত।
মৃদুমন্দ উদাস বাতাস
ভিজে ডাঙায় ভেসে বেড়ায়।
কল্পলোকের রাজপ্রাসাদের ছবি এঁকে যায়
বালুকাভরা আঙিনায়।
শ্রান্ত সারস দিন শেষে ঘরে ফেরে
সমুদ্রই তার ঘর-বার
সমুদ্রই বেঁচে থাকার সম্বল।
আসবে ফিরে আগামী
সোনালি আলোর সাথে—
তাই অস্তগামী দিনের শেষে
সব ছেড়ে যেতে হয়
ফিরে আসার অধীর প্রতীক্ষায়।
আলো-আঁধারি সমুদ্র সতত বহমান।
সুদূর দিকচক্রবালে
গোধূলিতে সূর্যদেবের অবতরণ!
পুনরাগমনায় চ

বাউলরাজা

সূর্য কুণ্ডু

মুক্তি খুঁজিস সকল জেনে?
মুক্তি পাওয়া অতই সোজা?
বন্ধ দুয়ারে আঘাত হেনে
কন্দরেতে শঙ্খ বাজা।

ভাবের ভেলার ঝরনাতলে
উজান স্রোতের মুখর বেগে
সব হারিয়ে ফকির হলে
সিক্ত পরান উঠবে জেগে।

সকল নিয়ে বাড়িয়ে বোঝা
যাস যদি তাঁর মহল পানে,
বাউলরাজা কেমনে বোঝা
আসবে ধেয়ে প্রেমের টানে?

পথের ধারের রিক্ত বকুল,
পথের চিহ্ন পথের ধুলো।
রাজা কেবল প্রেমেই আকুল
প্রাসাদ জুড়ে সোনার আলো।

নির্জন মূক শান্ত অধীর
দোয়াবতটে রাজার ভবন।
অন্দরে তার মুক্তিমণির
শ্রান্তিবিহীন বারিসিঞ্চন।

বিস্তারিত নীরব কূলে
সারি সারি বাঁধা তরী
কাটছে বাঁধন সকল ভুলে
বাউলরাজা তড়িঘড়ি।

জোয়ারভাটার পদধ্বনির
সঙ্গলিপ্সু গমনাগমন;
সঙ্গী যে তার পরশমণির
গভীর সুরে প্রাণ-আলাপন!

চলছে রাজার প্রাণের খেলা
মুক্তিমণির পরিয়ে মালা
অগম্য সে খেলার ছলে
আনন্দময় আপন ভোলা।

ধন্য প্রাণ

তপনকুমার ভট্টাচার্য

তোমাকে কিছুই পারিনি গো দিতে,
অভাগাকে তুমি দিয়েছ উজাড়
সেসব কিছুই গোছগাছ করে
মনে মনে ভাবি কত কাছে তবু
অনন্ত মাঝে এই যে পেয়েছি ঠাঁই
তোমার প্রসাদ প্রতি নিয়তই পাই
ঘুরেছি তোমার দোরে,
তোমার দুহাত ভরে।
দেখি চেয়ে চেয়ে রোজ
বৃথাই করেছি খোঁজ।
এই তো প্রচুর, এতেই ধন্য প্রাণ,
চারিদিকে দেখি তুমিই বিদ্যমান।

হাত ধরবে তুমি

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

কান্না পেলে তোমার পাশে
উদ্‌যাপনেও তোমার পাশে
ফের।
নদীর জলে পা ডুবিয়ে
টেনে আনি সেই কথাটার
জের।
খরাশেষের বৃষ্টিধারায়
তোমায় ভিজতে ডাকি।
পাঁজর-ঘেরা হৃদয়পুরে
তোমার ছবি রাখি।
মা, থাক তোমার কড়া শাসন,
আমার দুষ্টুমি—
একলা যখন দিশেহারা
হাত ধরবে তুমি।

রথযাত্রা

প্রব্রাজিকা বীতভয়প্রাণা

দেবভূমি উৎকলের নীল বনানী, নীলাকাশ ও নীলসমুদ্রের পৃষ্ঠপটে নীলচক্র সুশোভিত নভঃস্পর্শী মন্দিরে জগতের নাথ শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু বিরাজিত। বেদ, পুরাণ, ধর্ম ও দর্শনে তিনি কেবলমাত্র অপরিবর্তনীয় সনাতন নন, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের প্রতিভূ শ্রীজগন্নাথ মানবের অত্যন্ত আপনজন। সমগ্র মানবসমাজকে দর্শনদানে কৃতার্থ করতে তাঁর লীলাবিলাস রথযাত্রা।

রথযাত্রা সম্পর্কে বহু কিংবদন্তি আছে। তার মধ্যে ভবিষ্যোত্তর পুরাণে বর্ণিত উল্লেখযোগ্য একটি কিংবদন্তি : এক আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে উমা-মহেশ্বরের কথোপকথনকালে হঠাৎ মর্ত্যলোক থেকে সুমধুর ঘণ্টা, শঙ্খ, ভেরি, তুরি আদি মঙ্গলবাদ্য শ্রবণ করে মহাদেব প্রণাম জানালেন। উমা কারণ জানতে চাইলে শংকর ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। নরসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপুকে বধ করে ভগবান বিষ্ণু ভক্ত প্রহ্লাদকে ইন্দ্রপদে অভিষিক্ত করেছিলেন। কামকাঞ্চনের মায়ায় সংসার মোহাচ্ছন্ন। প্রহ্লাদের ক্ষেত্রেও তাই হল। অনন্যসুন্দরী শচী, অতুলনীয় সম্পদ ও অলকাপুরীর অকলন সুখে অতিষ্ঠ ভক্তিদেবী হারিয়ে গেলেন। অমরাবতীর ভোগবিলাসে প্রহ্লাদের ইষ্টবিস্মৃতি ঘটল। কিন্তু ভক্তপ্রিয় শ্রীভগবান ভক্তের পতন সইবেন কী করে! মায়ামোহের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে ভক্তকে যে খাঁটি সোনা করতে হবে!

সেদিন পুষ্প, তুলসী ও চন্দনের দিব্য সুগন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। মনোহর বেশে পাশামণ্ডপে ভগবান বিষ্ণু আবির্ভূত। কিন্তু প্রহ্লাদ ইন্দ্রাণীর সঙ্গে পাশাখেলায় এতই মত্ত যে প্রভুর উপস্থিতি বুঝতে পারেন না। শূন্য থেকে লীলা দর্শন করতে করতে নারদ চমকে ওঠেন। প্রভুর অবমাননা! ভক্তের এত অধঃপতন! প্রহ্লাদের জন্য তাঁর মন হাহাকার করে ওঠে। আজন্ম হরিবিলাসী প্রহ্লাদের এ কী দুর্ভাগ্য! তাঁর শত ধিক্কারে মোহভঙ্গ হয় প্রহ্লাদের। নতজানু প্রহ্লাদ দেবর্ষির বিধান মেনে পদব্রজে তীর্থ পর্যটন ও কঠোর তপশ্চর্যা শুরু করেন।

কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বাদশ বর্ষে সাগরতীর্থে উপস্থিত হন প্রহ্লাদ। মহোদধিতে স্থান, কল্পবটমূলে ধ্যান। ওঁকার ধ্বনিতে চতুর্দিক নিনাদিত। গোলোকাধিপতি আর স্থির থাকতে পারেন না। দর্শনদানে কৃতার্থ

সন্ন্যাসিনী, শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর

করেন পরম ভক্তকে। অনুতাপাশ্রুতে প্রহ্লাদ প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম প্রক্ষালন করেন। ভক্তবৎসল বর দিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। বরপ্রদানে পরীক্ষারও অন্ত ছিল না। ভক্তের ইন্দ্রপদে অরুচি, তাই বিষ্ণুপদ দিতে চাইলেন ভগবান। কিন্তু অচলা ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রহ্লাদ প্রভুর ভুবনমোহিনী মায়ায় আর মুগ্ধ হতে চান না। কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করলেন, ''লজ্জিত করবেন না প্রভু! যে 'পদ' আমার পতনের কারণ হয়েছে, সে 'পদ' আমার কাছে অতি তুচ্ছ।''

''নিজের জন্য না হলেও জগতের জন্য কিছু চাও প্রহ্লাদ।''

সবই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। প্রহ্লাদের মনে উদয় হল এক দিব্যাতিদিব্য বাসনা। পরমবাঞ্ছিতকে রথারূঢ় করে ওই পুণ্যক্ষেত্রে পরিক্রমা করিয়ে নবধা ভক্তিতে সেবা করবেন। শ্রীজগন্নাথের আদেশে এল মহাশূন্য থেকে নন্দীঘোষ বিমান। পরমপ্রেমে সমস্ত পূজাবিধি সমাপনান্তে প্রহ্লাদ প্রভু পরিশোভিত রথকে নীলাচলধাম পরিক্রমা করান। কলিযুগেও এই লীলাবিলাস করতে অঙ্গীকার করেন প্রভু। তাঁর লীলাস্থল সেই ভূখণ্ড 'শ্রীক্ষেত্র' নামে খ্যাত।

নানা পুরাণ, উপপুরাণ, ভক্তিশাস্ত্রে শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। সেগুলির মধ্যে স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, নারদপুরাণ, পদ্মপুরাণ, নীলাদ্রি মহোদয়, কপিল সংহিতা, বামদেব সংহিতা, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বছরে ছোটবড় চল্লিশটি যাত্রা শ্রীমন্দিরে আয়োজিত হয়ে থাকে। তার মধ্যে বারোটি যাত্রা প্রধান—স্নানপূর্ণিমা, রথযাত্রা, শয়নযাত্রা, অয়ন-যাত্রা, পার্শ্বপরিবর্তন, উদ্যান যাত্রা, পার্বণযাত্রা, পুষ্যপূজা যাত্রা, দোলকেলি যাত্রা, দমনক চতুর্দশী যাত্রা, অক্ষপূর্ণিমা যাত্রা ও অক্ষয়তৃতীয়া যাত্রা।

সমস্ত যাত্রার মধ্যে রথযাত্রাই শ্রেষ্ঠ। কেবল ভারত নয়, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই রথযাত্রা পালন করা হয়। উজ্জয়িনী নগরের ইতিহাস থেকে জানা যায় জৈনদের মধ্যে রথযাত্রার প্রচলন ছিল। চিনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণী থেকে জানা যায় পঞ্চম শতাব্দীতে পাটলিপুত্রে বৌদ্ধদের মধ্যে বুদ্ধদেব ও বোধিসত্ত্বের রথযাত্রার প্রচলন ছিল, মধ্য এশিয়ার খোটান অঞ্চলে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের রথযাত্রা সম্পাদিত হত। হিউয়েনসাং সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে রথযাত্রার কথা তাঁর ভ্রমণকাহিনিতে বর্ণনা করেছেন। প্রতি বছর শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধদেবের দন্তের রথযাত্রা প্রসিদ্ধ। নেপালে হিন্দু-বৌদ্ধ সম্মিলিত রথযাত্রা পালিত হয়। তাছাড়া ভৈরব, ভৈরবী ও কুমারী রথযাত্রা নেপালে খুবই জনপ্রিয়। আমেরিকা, জার্মানি, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, মরিশাস, আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, বালি, জাভা, সুমাত্রা, ব্রহ্মদেশেও রথযাত্রা জনপ্রিয়। ভারতে বিভিন্ন ধর্মক্ষেত্রে রথযাত্রার প্রচলন আছে। জম্মুতে দেবীর রথযাত্রা, হিমাচল প্রদেশের মানালিতে মনসাদেবীর রথযাত্রা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ওড়িশাতে আদিবাসীদের মধ্যে তাদের দেবতাদের রথযাত্রা পালিত হয়। অতীতে কোনারকে সূর্যদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হত। ভুবনেশ্বরে অনন্তবাসুদেব ও মহাপ্রভু লিঙ্গরাজের রথযাত্রা পালিত হয়।

শ্রীমন্দির ও ওড়িশার ইতিহাস 'মাদলাপঞ্জী' ও বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী পুরীর মহারাজা তৃতীয় অনঙ্গভীমদেবের রাজত্বকালে ১২৩০ সালে মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সেসময় শ্রীমন্দির ও গুণ্ডিচা মন্দিরের মাঝে মালিনী নামে এক নদী প্রবাহিত হত। তাই সেসময় ছয়টি রথ নির্মিত হত। নদীর উভয়পার্শ্বে তিনটি করে রথ রাখা হত ও বিগ্রহদের নৌকায় করে ওপারে নিয়ে যাওয়া হত। মহারাজ দ্বিতীয় নরসিংহদেবের রাজত্বকালে, ১২৭৮ থেকে ১৩০৭ সালের মধ্যে মালিনী নদীকে ভরাট করে তিনটি রথেই রথযাত্রা সম্পন্ন করা হয়।

বারবার জগন্নাথ মন্দির বিধর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতে রত্নবেদি থেকে বিগ্রহদের সোনপুর, চিলিকা, গড়কুজঙ্গ প্রভৃতি স্থানে 'পাতালী' (মাটির নিচে রাখা) করা হয়। তাই সে-সময়গুলিতে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত না হওয়ার কথা জানা যায়।

আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। রথযাত্রাকে ঘোষযাত্রা, মহাদেবী মহোৎসব, পতিতপাবন যাত্রা, নবদিনাত্মক যাত্রা, দশাবতার যাত্রা, গুণ্ডিচা মহোৎসব ও আড়প যাত্রা নামেও অভিহিত করা হয়।

রথযাত্রা এক দীর্ঘকালীন মহোৎসব। মাঘ শুক্লা পঞ্চমী এই মহোৎসবের আদ্য চরণ বা প্রথম দিবস। এই দিনে রথ নির্মাণের জন্য শ্রীক্ষেত্রে এনে রাখা কাঠগুলির পূজা করা হয়। চৈত্র শুক্লা অষ্টমী (নবমীযুক্ত) রথ মহোৎসবের দ্বিতীয় চরণ, এই দিন অভিমন্ত্রিত কাঠের চিরট আরম্ভ হয়। বৈশাখ শুক্লা তৃতীয়া তৃতীয় চরণ। এই দিন রথনির্মাণের শুভারম্ভ হয়। এরপর আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পুরুষোত্তম শ্রীজগন্নাথের শ্রীমুখ-নিঃসৃত আদেশ (স্কন্দপুরাণ, ২৯।৩৩।৩৪) :

''আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা।
তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়া সহ॥
মহোৎসবপ্রবৃত্ত্যর্থং প্রীণয়িত্বা দ্বিজান্ বহূন্।
গুণ্ডিচামণ্ডপং নাম যত্রাহমজনং পুরা॥"

—''আষাঢ় মাসের পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে রাম ও সুভদ্রা সহ রথে আমাকে অধিষ্ঠিত করে বহু ব্রাহ্মণকে প্রীত করে গুণ্ডিচা মণ্ডপে নিয়ে যাবে ও মহোৎসবের আয়োজন করবে।"

আষাঢ় শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে মহাপ্রভু নবযৌবন বেশ ধারণ করেন। প্রস্তুত রথত্রয়কে শ্রীমন্দিরের সামনে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করা হয়। দ্বিতীয়া তিথিতে ব্রাহ্মমুহূর্তে বিশ্বাবসু ও বিদ্যাপতি বংশজ সেবকরা স্তব করে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ করান। তারপর প্রাতঃকৃত্য সমাপন, প্রভাতী পূজার পর ব্রাহ্মণদের বেদপাঠ, ভক্তদের আনন্দধ্বনি ও সুমধুর বাদ্যের মধ্য দিয়ে প্রভুকে রথে আগমনের নিবেদন জানানো হয়। ক্রমান্বয়ে শ্রীসুদর্শন, শ্রীবলভদ্র, মা সুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথের পহণ্ডিযাত্রা শুরু হয়। 'পহুণ্ড' থেকে পহণ্ডি। পহুণ্ড অর্থ পদবিক্ষেপ।

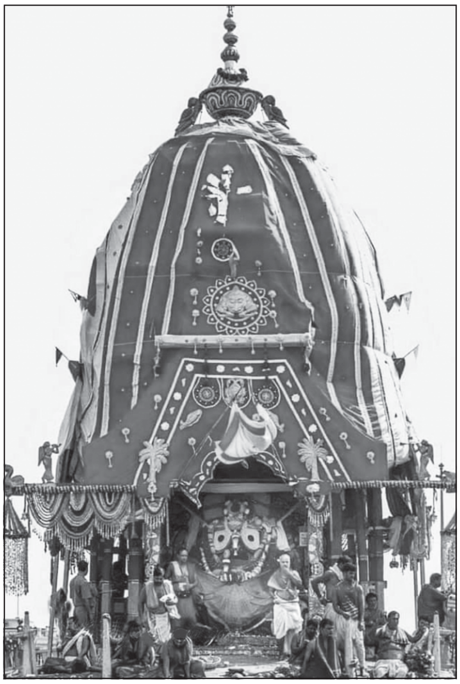
শ্রীবলভদ্র তালধ্বজ রথে যাত্রা করেন। বলভদ্রের আয়ুধ হল ও মূষল। এই রথের চাকার সংখ্যা চোদ্দো। এর উচ্চতা বত্রিশ হাত দশ আঙুল। এই রথটি সাতশো তেষট্টিটি কাঠের দ্বারা নির্মিত। রথের আবরণ রক্ত-নীল। রথের রক্ষক বাসুদেব, সারথি মাতলি, দ্বারপাল নন্দ ও সুনন্দ। রথরজ্জু বাসুকী, রথের দেবতাদ্বয় ব্রহ্মা ও শিব এবং রথের ধ্বজ হলেন উন্ননী।

দেবী সুভদ্রা ও সুদর্শনের রথের নাম দর্পদলন বা দেবদলন। প্রথমে সুদর্শন ও পরে দেবী সুভদ্রা এই রথে আসেন। দেবীর আয়ুধ পদ্ম। রথের উচ্চতা একত্রিশ হাত। রথের কাঠের সংখ্যা পাঁচশো তিরানব্বই। রথের চাকার সংখ্যা বারো। রথের আবরণ কৃষ্ণ-লোহিত। রথরক্ষক জয়দুর্গা, সারথি অর্জুন, দ্বারপালিকা ভুবনেশ্বরী, চক্র, গঙ্গা ও যমুনা। দর্পদলন রথের চারটি অশ্বের নাম রোচিকা, মোচিকা, জিতা ও অপরাজিতা। রথরজ্জু স্বর্ণচূড় নাগ, ধ্বজ নাদাম্বিকা।

তৃতীয় রথ নন্দিঘোষের শোভাবর্ধন করেন স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ। মহাপ্রভুর আয়ুধ চক্র ও শঙ্খ। নন্দিঘোষ রথের উচ্চতা তেত্রিশ হাত পাঁচ আঙুল। আটশো বত্রিশ খণ্ড কাঠে নির্মিত রথটির চাকার সংখ্যা ষোলো। রথের আবরণ রক্ত-পীত, রথরক্ষক গরুড়, সারথি দারুক, দ্বারপাল জয় ও বিজয়। চার অশ্ব—শঙ্খ, বলাহক, শ্বেত ও হরিদশ্ব। নাগিনী শঙ্খচূড় রথরজ্জু, রথের দেবী যোগমায়া। ন-জন পার্শ্বদেবতা—হনুমান, রাম, লক্ষ্মণ, নারায়ণ, কৃষ্ণ, গোবর্ধনধারী, চিন্তামণি, রাঘব ও নৃসিংহ। রথের শক্তি বিমলা ও বিরজা, ধ্বজাধিপতি মহাবীর

হনুমান। রথধ্বজা ত্রৈলোক্যমোহিনী।

তিন ঠাকুর রথে আসার পর পুরীধামের গজপতি রাজা ক্রমান্বয়ে বলভদ্র, সুভদ্রা ও জগন্নাথের রথে আসেন, পূজা সমাপনান্তে স্বর্ণ সম্মার্জনী দিয়ে তিনটি রথ মার্জনা করেন। এই রীতি 'ছেরাপহাঁরা' নামে খ্যাত। এরপর প্রথমে তালধ্বজ, তারপর দেবদলন ও শেষে নন্দিঘোষ রথ ভক্তদের আনন্দধ্বনির মধ্যে গুণ্ডিচা মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলে।



মহালক্ষ্মীর দেবদাসী 'জয়-বিজয় দ্বার' বন্ধ করে দেন। দ্বারের দুপাশে মহালক্ষ্মীর প্রতিনিধি পাণ্ডা ও মহাপ্রভুর প্রতিনিধি দইতাপতিদের মধ্যে মান-অভিমানের বাক্য বিনিময়ের পর মহালক্ষ্মীকে রসগোল্লা নিবেদন করে তাঁর মানভঞ্জন করা হয়। দ্বার উন্মুক্ত হয়; মহাপ্রভু সিংহাসনে ফিরে আসেন।

অতীতে সমস্ত যাত্রায় মহাপ্রভু সিংহাসন থেকে নেমে এসে ভক্তদের দর্শন দিতেন, পরে বিগ্রহগুলির অবয়বের সুরক্ষার জন্য

গুণ্ডিচা মন্দিরে নয় দিন থাকার পর পুনরায় তাঁরা তিনটি রথে শ্রীমন্দিরে ফিরে আসেন। এই যাত্রাকে উলটো রথ বলা হয়। শ্রীমন্দিরে রত্নসিংহাসনে ফেরার আগে সিংহদ্বারে একাদশী তিথিতে মহাপ্রভু, বলভদ্র ও সুভদ্রা দেবীর সোনার বেশ হয় যা অত্যন্ত আকর্ষণীয়। দ্বাদশী তিথিতে 'অধরপাণা' রীতি পালিত হয়। পঞ্চোপচারে পূজা সমাপনান্তে অধরপাণার পাত্রগুলি রথের উপরেই ভেঙে দেওয়া হয়। রথের পার্শ্ব দেবদেবী, চণ্ডী-চামুণ্ডারা এই অধরপাণা প্রসাদ গ্রহণ করে নিজ নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। ত্রয়োদশীর দিন প্রথমে বলভদ্র, সুদর্শন ও সুভদ্রা শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করেন। অভিমানিনী দেবী লক্ষ্মী মেঘনাদ প্রাচীরের কাছে ভেটমণ্ডপ থেকে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশের আয়োজন দেখতে পান। মায়ের নির্দেশে তাঁর সেবক পাণ্ডারা সিংহদ্বার বন্ধ করে দেন। প্রভু সিংহদ্বারের কাছে আগমন করার পর দ্বার উন্মুক্ত হলেও 'জয়বিজয় দ্বারে'র কাছে তাঁর গতি রুদ্ধ হয়।

কেবলমাত্র রথযাত্রায় সিংহাসন থেকে বিগ্রহদের যাত্রাস্থলীতে নিয়ে আসার রীতি প্রচলিত হয়। শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু ইন্দ্রদ্যুম্নের মহিষী রানি গুণ্ডিচাকে মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে প্রত্যেক বছর নয়দিনের জন্য শ্রীমন্দির ত্যাগ করে নিজের জন্মস্থানে অবস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাই এই যাত্রা গুণ্ডিচাযাত্রা নামেও অভিহিত হয়।

কিন্তু মহাপ্রভুর এই লীলাকে পতিতপাবন যাত্রা নামে অভিহিত করাটাই অধিক গ্রহণীয়। হিন্দুদের আরাধ্য দেবতা হলেও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা জগন্নাথ দর্শনে আসেন। শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর, বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, আর্য ও অনার্য প্রত্যেকের তিনি আরাধ্য দেবতা। মন্দিরের নিয়মানুযায়ী অহিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাই তৃষিত ভক্ত অপেক্ষা করে থাকে এই পুণ্য দিনটির জন্য। কেবল এইদিনেই ভক্ত তার পরম প্রিয়কে দর্শন ও আলিঙ্গন করার সুযোগ লাভ করে। অবশ্য বিগ্রহের নিরাপত্তার কারণে সরকারি নিয়মানুযায়ী

বর্তমানে ভক্ত ভগবানের আলিঙ্গন সুখ থেকে বঞ্চিত। তবে অন্তরাত্মা তৃপ্ত করে দর্শন করতে তো কোনও বাধা নেই! প্রভুদর্শনে পতিত মানব নিজেকে ধন্য মনে করে ও মোক্ষলাভের যোগ্য হয়। কপিল সংহিতায় রয়েছে,

''দোলে চ দোলগোবিন্দং চাপেষু মধুসূদনম্।
রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥''

—দোলবেদিতে দোলগোবিন্দ, চন্দনযাত্রায় নৌকায় মধুসূদন ও রথে শ্রীজগন্নাথরূপী বামনের দর্শনে পুনর্জন্ম হয় না।

শাস্ত্রের কথা ছেড়ে দিলেও বলা যায়, পরম আকাঙ্ক্ষিত এই দিনটিকে ভক্ত প্রাণভরে আস্বাদন করে। অতীব মনোহর ও প্রাণস্পর্শী এই মহোৎসব। এদিন ওড়িশার গৃহে গৃহে আনন্দের হিল্লোল জাগে। ওড়িয়া জাতির তিনি অতি আদরের 'কালিয়া, জগা, চকাডোলা (চাকার মতো চোখ যাঁর), কালিয়া সাআন্তে (সামন্ত অর্থাৎ প্রভু) মণিমা (মালিক)'। তাঁরই রথযাত্রা। সারা বছর ধরে দরিদ্র ভক্তও অর্থ সঞ্চয় করতে থাকে রথযাত্রায় শ্রীক্ষেত্রে আসবে বলে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত সূর্যোদয়ের অনেক আগে থেকেই উপযুক্ত স্থান সন্ধানে ব্যস্ত—পরমবাঞ্ছিত পতিতপাবন যাত্রা দেখে দেহমন শীতল করবে। পরম আদরের 'কালো মাণিকে'র রথযাত্রা শুরু হতে হতে অনেক বেলা হয়ে যায়। সূর্যদেব অস্তাচলে যাওয়ার উপক্রম শুরু করেন। গৃহে ফিরতে ব্যাকুল শিশুকে মা বোঝান : ''দাঁড়া, এই 'কালিয়া'টা চলে যাক, তারপরেই ফিরে যাব।'' 'রাজাধিরাজ' যে সামান্য নারীরও আদরের সন্তান, নয়নের মণি! মহাপ্রভু কখনও মাতৃস্নেহে স্নাত হচ্ছেন তো কখনও ভক্তের সেবায় রথযাত্রার ক্লান্তি অপনোদন করছেন। কখনও অভিমানী ভক্তের তিরস্কার মৃদুমন্দ হাসিতে সাদরে গ্রহণ করছেন তো কখনও রথের গতি রুদ্ধ করে অপেক্ষা করছেন প্রাণপ্রিয় ভক্ত শ্রীক্ষেত্রে এসে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত। আর ভক্ত রথে উঠে প্রভুর অঙ্গসেবা করতে করতে অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য হলে কান মুলে ক্ষমা চেয়ে আবার সেবায় প্রবৃত্ত হচ্ছেন।

রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে দেহত্যাগ করলে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে—এই বিশ্বাসে সুদূর অতীতে বহু মানুষ চলমান রথের সামনে লাফ দিতেন। ১৭০৮ সালে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন লিখেছেন, "Jagarynat's effigy is carried abroad in procession, mounted on a coach four storeyed high and people fell flat on the ground to have the honour to be crushed to pieces by each wheel.'' ১৮০৬ সালে ক্লডিয়াস বুকানন তাঁর বিবরণীতেও রথচক্রের নিচে ভক্তদের আত্মবিসর্জনের কথা উল্লেখ করেছেন।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে মানবমনের সমস্ত নেতিবাচক ভাব বা পতিত ভাবকে দূর করে সাত্ত্বিক আধ্যাত্মিক ভাবের জাগরণী প্রক্রিয়াকে পতিতপাবন যাত্রা বলা যায়। কঠোপনিষদ বলেন,

''আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥''

প্রতিটি মানবশরীর এক-একটি রথ। শরীররূপী রথের আত্মাই রথী, সারথি বুদ্ধি ও লাগাম মন। বুদ্ধিরূপ শাণিত শক্তির সাহায্যে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করলে মানবের পতিত ভাব দূর হয় ও আত্মার পাবনীশক্তি বলশালী হয়। মানব মোক্ষলাভ করে।

মহাবাহু শ্রীজগন্নাথ দুবাহু প্রসারিত করে মানবকে আত্মনিবেদনের আহ্বান জানাচ্ছেন। ভক্তই তাঁর জীবন। ভক্তের জন্য তিনি সব করতে পারেন। তিনি ভক্তের সারথি হতে পারেন, পাদপ্রক্ষালন করতে পারেন, ভক্তের উচ্ছিষ্ট খেতে পারেন, তার পদচিহ্ন বুকে বহন করতে পারেন। ভক্তের অভিযোগের যেমন শেষ নেই, প্রভুর করুণারও তেমন শেষ নেই। ভক্ত-ভগবানের মিলনের ঘনীভূত প্রকাশ জগন্নাথ সংস্কৃতি ও তাঁর রথযাত্রা। ✠

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম

মণিকুন্তলা হালদার দে

সূচনা পর্ব

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল বৌদ্ধধর্ম। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহামানব গৌতমবুদ্ধ যে-ধর্ম প্রচার করেছিলেন তা সম্পূর্ণরূপে ছিল যুক্তিনির্ভর ও কার্যকারণসম্ভূত যা রক্ষণশীল স্থবিরবাদী বা থেরবাদীদের ধর্মগ্রন্থ পালি তেপিটক (ত্রিপিটক)-এ বিবৃত হয়েছে। বিপুল ত্রিপিটক সাহিত্য বুদ্ধের উপদেশযুক্ত এবং গুরুশিষ্যপরম্পরায় শ্রুতির মাধ্যমে প্রচলিত ছিল। কিন্তু মুখপরম্পরায় রক্ষিত বেদের মতো বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণীগুলি যথাযথভাবে সুরক্ষার চেষ্টা করা হয়নি। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্তপিটকের (সূত্রপিটকের) দীঘনিকায়ের (দীর্ঘনিকায়ের) মহাপরিনিব্বান সুত্তন্তে (মহাপরিনির্বাণ সূত্রন্তে) দেখা যায় যে বুদ্ধ তাঁর দেশনার যথেচ্ছ ব্যাখ্যার আশঙ্কা করে তাঁর বাণীর চারভাবে সত্যতা নিরূপণ করার কথা শিষ্যদের বলেছিলেন। বস্তুত গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর থেকেই ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধসঙ্ঘে বিভেদের সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। উপরন্তু বুদ্ধবচনগুলি যথাযথভাবে রক্ষা করার জন্য কয়েকটি সংগীতি আহূত হয়।

প্রথম সংগীতিতে বুদ্ধের ধর্ম ও বিনয় আলোচিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সংগীতি হয়েছিল বেসালি (বৈশালী)-র বজ্জিপুত্রদের (বৃজিপুত্র) বিনয়বহির্ভূত আচার অনুষ্ঠানের ব্যতিক্রম করার জন্য। ফলস্বরূপ সঙ্ঘে ভেদ ঘটে। জানা যায় দশ হাজারেরও বেশি ভিক্ষু বৌদ্ধসঙ্ঘ পরিত্যাগ করে বৈশালির কাছাকাছি জায়গায় একটি মহাসভার আয়োজন করেছিলেন। এর নাম ‘মহাসংগীতি’, এবং এখানে যোগদানকারী ভিক্ষুরা ‘মহাসাংঘিক’ নামে খ্যাত হন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কয়েকশো বছরের মধ্যেই রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী মতবাদ যা বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী তা স্থবিরবাদ বা থেরবাদ থেকে বিভাজিত হয়ে মহাসাংঘিকবাদের সৃষ্টি হয়। এই দুটি শাখা থেকে ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন উপশাখার আবির্ভাব ঘটে। পালিসাহিত্যে উপশাখাগুলির সংখ্যা আঠারো। দ্বিতীয় সংগীতির একশো বছর পরে হয় তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতি। তৃতীয় সংগীতিতে কোনও বিভাজন না ঘটলেও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একটি নতুন ঘটনা

অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান, পালি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোকের বদান্যতায় সমগ্র পৃথিবীতে দিকে দিকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মদূত প্রেরণ করা হয়। তাছাড়া স্থবিরবাদ বা থেরবাদকে যথাযথভাবে রক্ষা করার উপায় ভিক্ষুসঙ্ঘকে জিজ্ঞাসা করা হয়। এই প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যম হিসেবে প্রথম কথাবত্ত (কথাবস্তু) নামে অভিধম্মপিটকের (অভিধর্ম-পিটকের) একটি গ্রন্থ সৃষ্টি হয়। এর আগে পর্যন্ত ধর্ম ও বিনয় সম্পর্কেই জানা যায়, অভিধর্মপিটকের কোনও অস্তিত্ব ছিল না।

এ-প্রসঙ্গে অধ্যাপক ড. নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখ্য। তিনি বলেছেন যে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টির বীজ মূলত ভারতীয় দর্শনের মধ্যে নিহিত ছিল। বুদ্ধদেবের সহজ সরল মতবাদে আকৃষ্ট হয়েছিল সাধারণ মানুষ কিন্তু পাশাপাশি শিক্ষিত সমাজকেও নাড়া দিয়েছিল বুদ্ধের আত্মতত্ত্ব সম্পকীয় চিত্তাকর্ষক ও প্রায় নতুন মতবাদগুলি। ফলস্বরূপ, বুদ্ধের উপদেশ সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার শুরু হয় এবং বলা বাহুল্য, বুদ্ধবচনের বিভিন্ন ব্যাখ্যার দ্বারা বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি চারটি প্রধান সম্প্রদায়ে—বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার—মিশে যায়।

এরপর আসে মহাযান ও হীনযান নামে প্রধান দুটি সম্প্রদায়ের কথা। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর নিকটবর্তী সময়ে গান্ধাররাজ কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের আমলে চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতিতে প্রথম মহাযান ও হীনযানের উল্লেখ পাওয়া যায়। চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বর্ণনানুযায়ী প্রাচীনপন্থী থেরবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায় হিসেবে মহাযানের আবির্ভাব ঘটে; দেশে দেশে মহাযান বিস্তারলাভ করে। মহাযান অর্থাৎ বৃহৎযান; মহাযানীরা রক্ষণশীলদের হীন অর্থাৎ নিম্নস্তরের যান বলে আখ্যা দেন। হীনযানের সঙ্গে মেশে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক শাখা দুটি এবং মহাযানের সঙ্গে মিশে যায় মাধ্যমিক ও যোগাচার দর্শনের শাখা দুটি।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বৌদ্ধধর্মকে বিচার করলে দেখা যায় যে এর ক্রমবিকাশে তিনটি স্তর বা পর্ব আছে—আভিধার্মিক স্তর, বুদ্ধের গূঢ় শিক্ষাতত্ত্বের ক্রমবিকাশের স্তর এবং মন্ত্রতন্ত্র সম্বলিত স্তর। প্রথম স্তরে বৌদ্ধধর্মের আদিরূপ ছিল অক্ষুণ্ণ, প্রধানত বাস্তববাদী মানুষের মানসিকতা নিয়ে বিশ্লেষণ করে সম্পূর্ণরূপে পালিভাষায় লিখিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্ব থেকে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। দেখা যায় ধর্মসংক্রান্ত বিধানগুলির বিভিন্ন রূপ ব্যাখ্যার প্রবণতা যা মহাসাংঘিকরা দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতিতে আনয়ন করেছিলেন। তখন বিহারজীবনের গুরুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকলেও তার সঙ্গে নতুন বোধিসত্ত্বের (যিনি বুদ্ধত্ব ও বোধিজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হয়েছেন) আদর্শযুক্ত চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছিল। এই আদর্শে গৃহী বা সন্ন্যাসী সকলেই পুণ্যকর্মের দ্বারা যোগ্যতা অর্জন করে বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারতেন। প্রজ্ঞা বা জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা বস্তুকে যথাযথভাবে জানাই ছিল সেযুগের বৌদ্ধধর্মের আদর্শ। এই সময়েই সংস্কৃত ভাষা বা বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় ধর্মীয় গ্রন্থগুলি রচিত হয়। এককথায় বলা যায় নতুন আদর্শযুক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ই মহাযান আখ্যা পায়।

জনসাধারণের মধ্যে মহাযান মতবাদ প্রচারের কৃতিত্ব মহাসাংঘিক ও তাঁদের বিভিন্ন শাখার প্রাপ্য। তাঁরাই বুদ্ধের ওপর দেবত্ব আরোপ করে বুদ্ধের বিভিন্ন প্রতীকচিহ্নের পুজো শুরু করেন এবং পরবর্তী সময়ে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ ও বুদ্ধমূর্তির পুজোও শুরু করেন। দেশবিদেশের মন্দির ও বিহারগুলিতে বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং এইভাবেই মহাযান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ধর্মের বহুল রূপান্তর ঘটে যায়। বোধিসত্ত্বদের মনোবৃত্তির (অধিমুক্তিচর্যা) দশটি ভূমির কল্পনার কথা উল্লিখিত যথা—প্রমুদিতা (আনন্দপূর্ণ স্থান), বিমলা (অকলঙ্ক, বিশুদ্ধ স্থান),

প্রভাবরী (পবিত্র প্রভাযুক্ত স্থান), অর্চিষ্মতী (বীর্যযুক্ত উজ্জ্বল স্থান), সুদুর্যয়া (দুর্জয় স্থান), অভিমুখী (প্রতীত্যসমুৎপন্নের দিকে অভিমুখী স্থান), দুরঙ্গমা (ধ্যান সহযোগে দূরে গমন করার স্থান), অচলা (স্থির স্থান), সাধুমতী (কুশল চিন্তার স্থান) ও ধর্মমেঘা (ধর্ম বা জ্ঞানের মেঘযুক্ত স্থান)। উপরিউক্ত দশটি ভূমি অতিক্রম করলে বোধিসত্ত্বগণের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ঘটে। অন্যদিকে বলা যায় যে পাপীদের উদ্ধারের মাধ্যমরূপে বোধিসত্ত্বরা বিরাজিত, যাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য হল জীবগণের প্রার্থনা পূরণ করা। এককথায়, মহাযান ধর্মের লক্ষ্য ছিল সমষ্টির মুক্তি যেখানে হীনযানের লক্ষ্য ছিল ব্যষ্টির মুক্তি। চিনা পরিব্রাজক ইৎসিঙ ভারতভ্রমণকালে দুটি 'যানে'রই একত্র অস্তিত্বের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এক্ষেত্রে 'যান' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন জাপানের সুবিখ্যাত লেখক তাকাকুসু।

'যান' কথাটিকে সাধারণভাবে 'গমন করবার যন্ত্র' অর্থে ব্যবহার না করে 'জীবনের একটি ধারা' অর্থে ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন ভিক্ষু সঙ্ঘরক্ষিত। শব্দটির অর্থ 'মার্গ' অর্থাৎ নির্বাণপ্রাপ্তির মার্গ বলেও ধরা হয়। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্বাব্দে রচিত 'সদ্ধর্ম পুণ্ডরীকসূত্রে' 'যান' শব্দটির প্রথম ও ব্যাপক উল্লেখ পাওয়া যায়।

যাই হোক, মোটামুটিভাবে তিনটি যানের বর্ণনা পাওয়া যায় প্রাচীন বৌদ্ধধর্মে : সাবক যান (শ্রাবক যান)—অর্থাৎ যিনি শ্রবণ করেন বা শিক্ষার্থী, পচ্চেকবুদ্ধযান (প্রত্যেকবুদ্ধ যান)—যিনি বাইরের জগতের কোনওরকম সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ এককভাবে অর্হত্ত্বলাভ করেছেন, এবং বোধিসত্ত্ব যান বা সম্ভাব্য আবির্ভূত হবেন এমন বুদ্ধ যিনি জন্মজন্মান্তর ধরে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য পারমী ও দশভূমি পূর্ণ করেছেন এবং জগতের সকলের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন।

বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় বোধিচিত্ত ও প্রণিধানবলের। বোধিচিত্ত দু-ধরনের—প্রজ্ঞা (অতি প্রাকৃত জ্ঞান) ও করুণা (সর্বজনীন প্রেম)। সুজুকি বলেছেন যে বোধিচিত্ত সবরকম নিমিত্তবাদ থেকে মুক্ত অর্থাৎ পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন এবং অষ্টাদশ ধাতু সব বস্তু থেকেই মুক্ত এবং এটি সর্বজনীন, নির্দিষ্ট নয়। মহাযানে বুদ্ধের তিনটি কায়ের (ত্রিকায়) কল্পনা করা হয়েছে—নির্মাণকায়, সম্ভোগকায় ও ধর্মকায়। মহাযানের সদ্ধর্মপুণ্ডরীক ও সুবর্ণপ্রভাসসূত্রে কায়গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। আবার অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞা-পারমিতাসূত্রে ও নাগার্জুনের মাধ্যমিকশাস্ত্রে দুটি কায়ের কথা বলা হয়েছে—রূপ বা নির্মাণকায় এবং ধর্মকায়। যোগাচার বৌদ্ধধর্মে সম্ভোগকায়ের কথা বলা আছে। এছাড়াও সূত্রালঙ্কার, অভিসময়া-লংকারকারিকা, পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি গ্রন্থেও বিভিন্নভাবে বুদ্ধের কায়ের কল্পনা করা হয়েছে। ফরাসি অধ্যাপক ম্যাসন-ওরেল (Masson-Ourel) তাঁর একটি প্রবন্ধে অঙ্গুত্তরনিকায়ের একটি উদ্ধৃতি বর্ণনা করে দেখিয়েছেন যে মহাযান কায়কল্পনার বীজ হীনযানীদের মধ্যেই নিহিত। মহাসাংঘিকদের গ্রন্থেও ত্রিকায় কল্পনার কথা রয়েছে। *ক্রমশ*

সহায়ক গ্রন্থ

১। মণিকুন্তলা হালদার দে, *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস*, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৬

২। I-Tsing, (Translated by J Takakusu), *A Record of the Buddhist Religion: As practiced in India and the Malay*, (AD 671-695), Clarendon Press: Oxford, 1896

তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

গৌতম বুদ্ধ কখনও তিব্বত যাননি। তিব্বতে গিয়েছিল বুদ্ধভাবনা; নিয়ে গিয়েছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা। সম্রাট অশোকের সময় ভারতীয় শ্রমণদের চিনে পদার্পণের কথা জানা যায়। কিন্তু তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রথম পৌঁছয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি। সম্রাট অশোকের সময়ে চিনে বেশ কিছু বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। তিব্বতে ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পক্ষে বুদ্ধের বাণী প্রচার সহজ ছিল না। প্রথম ধর্মপ্রাণ সম্রাট সংস্তান (তিব্বতি ভাষায় স্রংসান) গাম্পো ও পরবর্তী তিনজন সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটে।



সম্রাট সংস্তান গাম্পো (চিত্র)

কেবল ধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, শক্তিশালী শাসক হিসেবেও গাম্পো নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তম শতাব্দীতে তিনি তিব্বতকে এক ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্রের রূপ দেন। গাম্পো ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে চিন আক্রমণ করেন। তাঙ্গ বংশীয় চিন সম্রাট তাইত সুঙ্গ সন্ধি করতে বাধ্য হয়ে কন্যা ওয়েনচেঙ্গকে গাম্পোর সঙ্গে বিবাহ দেন। দু-বছর পর গাম্পো নেপালের রাজা অংশবর্মার কন্যা ভৃকুটী-র পাণিগ্রহণ করেন। দুই রানিই বৌদ্ধধর্মের আবহাওয়ায় লালিত পালিত হওয়ায় গাম্পোও বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। দুই রানির জন্য তিনি দুটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। একটি জোখাং ও অন্যটি অপেক্ষাকৃত ছোট রামোচে। কৃষি থেকে শিক্ষা সবক্ষেত্রেই গাম্পো উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। খোটান, কাশ্মীর, নেপাল, ভারত, চিনের মতো উন্নত দেশগুলির শিক্ষাসংস্কৃতির ধারায় তিব্বতকে সমৃদ্ধ করেন তিনি। কাশ্মীরের সারদা লিপি এবং মগধ- বাংলার নাগরী অক্ষরের বর্ণমালা থেকে তিব্বতে বুচন বর্ণমালার প্রবর্তনও তাঁর অবদান। সামগ্রিক মূল্যায়নে গাম্পোকে তাই 'তিব্বতের অশোক' বলা হয়।

তিব্বতের মানুষজনের কাছে 'রাক্ষিতা' আর 'আতিশা'র উল্লেখ প্রায়ই পাওয়া যায়। এঁরা বাংলার

প্রাক্তন অধ্যাপক ও গবেষক, অর্থনীতি, হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

শান্তরক্ষিত আর অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। আজও এঁরা ধর্ম ও ইতিহাসমনস্ক তিব্বতিদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র। এই দুই বাঙালি পণ্ডিতের স্মৃতিবিজড়িত শেরা ও নেথাং মনাস্টারি আজও বিদ্যমান। নেথাং-এ বাহাত্তর বছর বয়সে দীপঙ্কর দেহত্যাগ করেন।

হিন্দু সাধকদের মধ্যে যেমন পুরী, গিরি, সৎনামি প্রভৃতি মার্গ বা সম্প্রদায়ের সন্ধান মেলে, তিব্বতি বৌদ্ধধর্মও তেমনই চারটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—নিঙ্গমো, কাগিউ, শাক্য ও জেলুগ। তিব্বতি ভাষায় 'শাক্য' শব্দের অর্থ অহল্যা জমি। প্রখ্যাত পণ্ডিত তিব্বতি বৌদ্ধ ধর্মগুরু সংখ্যাপার শিষ্যরা তাঁর জীবদ্দশায় তিনটি জেলুগ মঠ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করেন—গান্ডেন, শেরা ও ড্রেপাং। চিনা অধিগ্রহণের আগে প্রথম দুটিতে পাঁচ হাজার করে সন্ন্যাসী বাস করতেন। ড্রেপাং-এ ছিলেন সাত হাজার জন। লাসা থেকে কিছু দূরে বেশ খানিকটা উপরে রুক্ষ, বৃক্ষহীন পাহাড়ে বর্তমানে এগুলি নতুনভাবে গড়ে তুলছেন ধর্মপ্রাণ তিব্বতিরা। দলাই লামা এই জেলুগ গোষ্ঠীর ধর্মগুরু ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি সমগ্র তিব্বতিদের শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন।


পদ্মসম্ভব

অষ্টম শতকে চিনা তুর্কিস্তান, ব্যাকট্রিয়া গান্ধার এবং বিশেষ করে খোটানে মুসলিমদের হাতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হত্যার কারণে প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে তিব্বতে বৌদ্ধদের আগমন ঘটতে থাকে। একইসঙ্গে তিব্বতে 'বন' ধর্মাবলম্বীদের হাতেও বৌদ্ধভিক্ষু ও মানুষজনের নিগ্রহ চলতে থাকে।

অষ্টম শতকেই দ্বিতীয় ধর্মপ্রাণ রাজা ত্রিশং দেতশেঙ বঙ্গদেশ থেকে শান্তরক্ষিতকে তিব্বতে নিয়ে যান। শান্তরক্ষিত নানা স্থানে বৌদ্ধ ভাবনা প্রচার ও বক্তৃতা করা সত্ত্বেও তেমন সফল হননি। কারণ তাঁর যাওয়ার পরই সেখানে এক মহামারি দেখা দেয়। বনপন্থীরা শান্তরক্ষিতকে এজন্য দায়ী করে। শান্তরক্ষিত তখন রাজাকে অনুরোধ করেন ভারতবর্ষ থেকে পদ্মসম্ভবকে আমন্ত্রণ করতে। পল্লব শাসিত কাঞ্চীর পদ্মসম্ভব সেসময় নালন্দায় অবস্থান করছিলেন।

পদ্মসম্ভব তখন এক অত্যন্ত পরিচিত নাম। কেবলমাত্র তার্কিক এবং বাগ্মী দার্শনিক হিসেবেই নয়, তিনি বিখ্যাত ছিলেন এক উচ্চকোটির সাধক, দুর্জ্ঞেয়বাদী, গুপ্ত বিজ্ঞানী (Occult Science) তথা তন্ত্রসিদ্ধ সাধকরূপেও। ইন্দ্রজালেও দক্ষ ছিলেন। মাত্র আঠারো মাস তিব্বতে থেকে তিনি দানবীয় বনপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে আনেন।

পদ্মসম্ভব সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তি আজও তিব্বতিদের মুখে শোনা যায়—তিনি জলের উপর হাঁটতে পারতেন, উড়ন্ত পাখি মুঠোয় ধরতেন প্রভৃতি। জ্ঞানী দার্শনিক শান্তরক্ষিত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন তিব্বতিদের কাছে অতি সম্মাননীয় ছিলেন। কিন্তু পদ্মসম্ভবের গভীর প্রজ্ঞা ও দার্শনিক জ্ঞান বন্য তিব্বতিদের হৃদয় সহজেই হরণ করে নিয়েছিল। এই দুই মহাপ্রাণ ভারতীয় ৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ওদন্তপুরির ছাঁচে সামায়েতে প্রথম মঠ স্থাপনে হাত দেন। সেটি সম্পূর্ণ হয় ৭৮৭ সালে।

পদ্মসম্ভবের অবস্থান স্বল্পকালের হলেও তিনি তিব্বতের মানুষের মনে গভীর দাগ কেটেছিলেন। তাঁর ছিল সুঠাম শরীর, মঙ্গোলীয় মুখাবয়ব। তিনি রাজকীয় পোশাক পরতেন। কখনও কখনও নরমুণ্ডের শিরস্ত্রাণ ধারণ করতেন। কোমরে তরবারি। এর ফলে এক ভীতিপ্রদ, শক্তিশালী

প্রভাবেরও সৃষ্টি হত।

ত্রিশং দেতশেঙের সময়কার অন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা Council of Lhasa প্রতিষ্ঠা। তিনি শান্তরক্ষিতের অন্যতম ভারতীয় শিষ্য কমলশীলকে তিব্বতে এনে জনৈক চিনা বৌদ্ধ পণ্ডিত ও চ্যানমার্গী সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিতর্কের আয়োজন করেন। বিতর্কের বিষয় ছিল : পূর্ণ মুক্তি ধীরে ধীরে দীর্ঘ ধ্যানের মাধ্যমে হয়, নাকি তা হঠাৎ কোনও বিশেষ অনুভূতির ফল। কমলশীলের মত ছিল দীর্ঘ সাধনায় অষ্টাঙ্গিক মার্গের পক্ষে। চিনা সন্ন্যাসীর ছিল ভিন্ন মত। যাই হোক, এই সময়ই তিব্বতে মহাযান পন্থা চালু হয় বলে মনে করা হয়। তিব্বতরাজের নির্দেশমতো ঠিক হয় প্রথমে সর্বাস্তিবাদী ভাবনা, তারপর মাধ্যমিক ও যোগপন্থা হয়ে শেষে তান্ত্রিক সাধনাই সর্বস্বীকৃত পথ হবে।



দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (চিত্র)



শান্তরক্ষিত (চিত্র)

নবম শতকে তৃতীয় ধর্মপ্রাণ সম্রাট হন রাল পা চেন। কিন্তু তিনি বনপন্থীদের চক্রান্তে নিহত হলে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রবল বাধার মুখে পড়ে।

চতুর্থ ধার্মিক রাজা ইয়েশে ও-র কাছে কিছু নেতৃস্থানীয় বিদ্বান মানুষ অনুরোধ করেন, রাজনিরাপত্তা দিয়ে বিক্রমশীলার স্বনামধন্য শিক্ষক অতীশ দীপঙ্করকে তিব্বতে নিয়ে আসা হোক। শেষ জীবনে ইয়েশে সন্ন্যাসী হতে চেয়েছিলেন। অতীশকে আনার জন্য তিনি তাঁর প্রজাদের থেকে স্বর্ণ সংগ্রহে নামলেন। অবশেষে বিক্রমশীলার উদ্দেশে যাত্রাকালে তিনি প্রতিবেশী এক মুসলিম রাজার হাতে বন্দি হলেন। মুসলিম রাজা শর্ত দেন : ইয়েশেকে হয় মুসলিম হতে হবে, নয়তো তাঁর ওজনের সমান স্বর্ণ মুক্তিপণ হিসেবে দিতে হবে।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রশ্নই আসে না। কিন্তু অত সোনা ইয়েশে কোথায় পাবেন? তখন তাঁর পরম অনুগত ধর্মপ্রাণ ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্ণ সংগ্রহে নেমে পড়লেন। মাসের পর মাস এমনকী বছর গড়িয়ে গেলেও প্রয়োজনীয় সোনা সংগৃহীত হল না দেখে রাজা বললেন, ''আমার বয়স হয়েছে।... সুতরাং সংগৃহীত সোনা দিয়ে তোমরা দীপঙ্করকে আনো। আমি মৃত্যুবরণে রাজি।'' মুসলিম শাসক ইয়েশেকে হত্যা করলেন।

অবশেষে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধপণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতে উপস্থিত হলেন। দীপঙ্করের তিব্বত গমন তাঁর পাঁচশো বছর আগে চিনে বোধিধর্মের গমনের মতো তাৎপর্য বহন করে। প্রায় বারো বছর তিনি তিব্বতে ছিলেন এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কঠোর পরিশ্রম করে তিনি মঠে শৃঙ্খলা আনেন, পরিশুদ্ধ করেন তান্ত্রিক আচার। কদম স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

আজকের তিব্বতে যে-বৌদ্ধধর্মের চর্চা বর্তমান তার সবটাই প্রায় শান্তরক্ষিত ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই দুই বঙ্গসন্তানের সৃষ্ট বলা যায়। পোপের খ্রিস্টভাবনার সংস্কারে হুশ, কেলভিন, মার্টিন লুথারের যে-ভূমিকা, তেমনটিই ছিল এই দুজনের প্রয়াস। আজও তিব্বতে গেলে দেখা যায় ধর্মপ্রাণ তিব্বতিদের মধ্যে কী পরিমাণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিয়ে 'আতিশা' আর 'রাক্ষিতা' অবস্থান করছেন। সেখানে এঁদের স্থান গৌতম বুদ্ধের ঠিক পরেই।

উভয়ভারতী

স্বামী একরূপানন্দ

রত্নগর্ভা ভারতমাতার কোল আলো করে কত যে মহান ও পবিত্র সন্তান-সন্ততি জন্ম নিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁদের পবিত্র জীবনকথা অনুধ্যান করে মানুষ দেবতা হতে পারে। এমন অনেকের কথাই আমরা তেমন জানি না, যাঁরা বিদ্যা, বুদ্ধি, পবিত্রতা, পাতিব্রত্য, আত্মবিশ্বাস, সাহস ও গৃহস্থধর্মে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন।

এ-প্রবন্ধে এমন এক নারীর কথা আলোচনা করব যিনি ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য শংকরকে বিদ্যাবুদ্ধিতে, প্রতিভায় অবাক করে দিয়েছিলেন। তিনি উভয়ভারতী—মধ্যযুগের দিক্‌পাল বেদান্তবাদী কুমারিল ভট্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য মণ্ডন মিশ্রের পত্নী। তাঁর চরিত্র চিরকাল অনুপ্রেরণাপ্রদ।

বিহার প্রদেশের মিথিলা নগরীতে সুবর্ণভদ্রার তটে এক ক্ষুদ্র কুটিরে বিষ্ণুমিত্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন। একমাত্র কন্যা উভয়ভারতীকে তিনি শাস্ত্রে বিদুষী করে তোলেন। রূপে-গুণে অদ্বিতীয়া উভয়ভারতী পনেরো বছর বয়সে ষড়্‌দর্শন, চার বেদ, শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ও কাব্য আয়ত্ত করেন। একদিন তাঁদের গৃহে জটাধারী এক ব্রহ্মচারী এলেন সামগান করতে করতে। সামছন্দের সুমধুর ঝঙ্কার অন্তঃপুরে পৌঁছলে বিষ্ণুমিত্রের সহধর্মিণী মন্দা দেবী ও কন্যা উৎসুক হয়ে বাইরে এলেন। কন্যাকে দেখে ব্রহ্মচারী করুণাসিক্ত নয়নে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, ‘‘এর সন্ন্যাসযোগ আছে।’’ পরে মন্দা দেবীর অনুরোধে উভয়ভারতীর হাত দেখে ব্রহ্মচারী বলেছিলেন, ‘‘এর রাজসৌভাগ্য আছে, এর পতি হবেন বিশ্বখ্যাত বিদ্বান ও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী। কিন্তু তিনি ভারতবিখ্যাত এক যতির কাছে পরাজিত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন।’’ শুনে মাতাপিতা চিন্তিত হলে ব্রহ্মচারী আরও বললেন, ‘‘এমন লক্ষ্মী-সরস্বতী তুল্য কন্যা তোমাদের ঘরে জন্ম নিয়েছে তাতেই তোমাদের গর্ব হওয়া উচিত, দুঃখ কোরো না।’’

কিছুদিন পর ঘটক গোবিন্দ উভয়ভারতীর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে বিষ্ণুমিত্রের কাছে আসেন। পাত্র ঐশ্বর্যবান হিমমিত্রের বিদ্বান পুত্র মণ্ডন মিশ্র। বিষ্ণুমিত্র বললেন, ‘‘আমার মতো দরিদ্রের কন্যাকে

সন্ন্যাসী, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, তমলুক

কি হিমমিত্র তাঁর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবেন?" তাঁকে আশ্বস্ত করে গোবিন্দ বলেছিলেন, "আপনার কন্যা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। হিমমিত্রের ঐশ্বর্যের অভাব নেই, তাঁর প্রয়োজন সরস্বতীতুল্য পুত্রবধূ।" ঘটকের চেষ্টায় এই বিবাহ স্থির হল। বিষ্ণুমিত্র হিমমিত্রকে বলেন, "কন্যা জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, অনুমতি দিলে বিবাহের দিন ও লগ্ন সে নিজেই স্থির করতে পারবে।" এই প্রস্তাব হিমমিত্র সানন্দে গ্রহণ করলেন। শুভদিনে তাঁদের বিবাহ হল।

আজ থেকে প্রায় বারোশো বছর আগে এক নারীর জ্যোতিষশাস্ত্রে এত অধিকার ছিল যে, সেযুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রের পিতা পর্যন্ত পুত্রের বিবাহের দিন ও সময় নির্ধারণের জন্য ভাবী পুত্রবধূর উপর আস্থা রেখেছিলেন। আজও আমরা ভাবতে পারি না কন্যা নিজের বিবাহের দিন ও লগ্ন নিজেই স্থির করবেন। এ-ঘটনা প্রমাণ করে সেযুগের পণ্ডিতসমাজ নারীর যোগ্যতার স্বীকৃতি দিত, যা আজও আমরা সর্বদা নারীকে দিতে পারি না।

বিবাহের পর মণ্ডন মিশ্র ও উভয়ভারতী মাহিষ্মতী নগরে ওঙ্কারনাথের কাছে নর্মদা ও মাহিষ্মতী নদীর সঙ্গমস্থলে প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে দাসদাসী পরিবৃত হয়ে সুখে বাস করছিলেন। সেটি সেকালের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাচর্চার স্থানে পরিণত হয়েছিল। বহু ছাত্র সেখানে অধ্যয়নের জন্য আসত। কিছুদিন পর হিমমিত্র অসুস্থ হয়ে শরীরত্যাগ করেন। মণ্ডন মিশ্র নির্দিষ্ট দিনে পিতার শ্রাদ্ধের আয়োজন করলেন। বহু ব্রাহ্মণ, জ্ঞানীগুণীকে আমন্ত্রণ করে তাঁদের সেবা করলেন ও বহু দরিদ্রকে অকাতরে দান করলেন।

এদিকে ভারতবিখ্যাত ষোলো বছরের পণ্ডিত আচার্য শংকর যখন উত্তরকাশীতে, একদিন মহর্ষি ব্যাসদেব ব্রাহ্মণের বেশে এসে তাঁকে ব্রহ্মসূত্র থেকে কিছু প্রশ্ন করেন। তাঁর শাস্ত্রে অধিকার দেখে শংকর তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে ব্রাহ্মণ আত্মপরিচয় দেন। শংকর রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যগ্রন্থটি দেখে তিনি বলেছিলেন, "অতি সুন্দর হয়েছে। এ তোমারই যোগ্য।" শংকর সমাধিতে শরীরত্যাগের অনুমতি চাইলে মহর্ষি বললেন, "তোমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। তুমি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের পরাজিত করে স্বমতে আনয়ন করো। তোমার আয়ু ষোলো বছর থেকে বাড়িয়ে বত্রিশ বছর করে দিলাম। এখন তোমার প্রথম কাজ হবে শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক কুমারিল ভট্টকে পরাজিত করে তাঁকে দিয়ে ভাষ্যের বার্তিক রচনা করা।"

বার্তিক রচনার অর্থ গ্রন্থের দোষগুণ নির্ণয় এবং টীকা রচনার অর্থ ব্যাখ্যা। শংকরের রচনার দোষগুণ নির্ণয়ের ক্ষমতা কুমারিল ভট্টেরই ছিল। তিনি বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের প্রভাব খর্ব করে বৈদিক সনাতন ধর্ম পুনঃস্থাপন করেছিলেন। জৈমিনি মীমাংসা দর্শনের দোষদর্শন করে ঈশ্বর অসিদ্ধ প্রমাণ করার অপরাধে কুমারিল তখন তুষানলে প্রবেশ করে আত্মহত্যার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় আচার্য শংকর এসে তাঁকে বিচারে আহ্বান করলে কুমারিল দেহত্যাগের সংকল্প ছাড়তে রাজি হলেন না। বললেন, তাঁর শিষ্য মণ্ডন মিশ্রকে পরাজিত করলেই তাঁকে পরাজিত করা হবে। এও জানালেন, মণ্ডনের স্ত্রী উভয়ভারতী বিচারসভার মধ্যস্থতা করবেন।

আচার্য শংকর ওঙ্কারনাথে এসে মণ্ডন মিশ্রের সঙ্গে দেখা করতে চান, কিন্তু তখন মণ্ডন পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে ঋষি জৈমিনি ও ব্যাসদেবকে মন্ত্রবলে এনে তাঁদের সেবা করছেন। তাই তিনি কারও সঙ্গেই দেখা করতে রাজি হলেন না। আচার্য তখন যোগবলে আকাশপথে মণ্ডনের প্রাঙ্গণে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে এলেন। এতে কর্মবাদী মণ্ডন ক্ষুব্ধ হয়ে অপরিচিত সন্ন্যাসীকে উপহাস করতে থাকেন। তাঁর অশালীন ও উদ্ধত আচরণ দেখে মহর্ষি ব্যাসদেব

বলেন, ''মণ্ডন, ইনি যতি, সুতরাং বিষ্ণুস্বরূপ, তাছাড়া অতিথি। তাঁর যথোপযুক্ত সম্মান করা তোমার উচিত।'' মণ্ডন লজ্জিত হয়ে শংকরের কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং বসিয়ে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করলেন। পরদিন বিচার শুরু হল। উভয়ের ইচ্ছা ছিল ব্যাসদেব ও ঋষি জৈমিনি বিচারের মধ্যস্থতা করবেন। কিন্তু উভয় ঋষিই উভয়ভারতীকে এই বিচারের মধ্যস্থ করতে বলেন। এতে আচার্য শংকর ও মণ্ডন উভয়ে সম্মত হন।

শর্ত হল, যিনি পরাজিত হবেন তিনি গ্রহণ করবেন বিজেতার মত। মণ্ডনের মত ছিল, কর্মের মাধ্যমে অনন্ত স্বর্গসুখ লাভের দ্বারা মানুষের মুক্তি হয়। জনকাদি রাজা সেইভাবে মুক্ত হয়েছেন। শংকরের মত, অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানই বেদের একমাত্র তাৎপর্য। কর্ম বা উপাসনা চিত্তশুদ্ধির উপায় মাত্র। মধ্যাহ্ন গড়িয়ে গেল, বিচারে কেউ পরাজিত হচ্ছেন না। তখন উভয়ভারতী বললেন, ''মধ্যাহ্ন অতীত প্রায়, আমি স্বামীর মধ্যাহ্ন আহারের জন্য অন্নব্যঞ্জন তৈরি করব। তাই দূর থেকে আপনাদের বিচার শুনব।'' যাওয়ার পূর্বে দুজনের গলায় একটি করে মালা পরিয়ে তিনি বললেন, ''যাঁর মালা আগে মলিন হবে তিনি পরাজিত বিবেচিত হবেন।'' এইভাবে সাতদিন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বিচার চলছিল। বহু দেবদেবী আকাশমার্গ থেকে সেই বিচার দেখছিলেন ও শুনছিলেন। অষ্টম দিনে উভয়ভারতী দেখলেন স্বামীর গলার মালা মলিন হতে শুরু করেছে। তিনি বুঝলেন মণ্ডন মিশ্র পরাজিত হলেন।

দুই দিকপাল পণ্ডিতের বিচারসভায় মধ্যস্থতা করছেন এক নারী। নিজ যোগ্যতায় উভয়ভারতী সে-আসন অলংকৃত করার অধিকারিণী হয়েছিলেন। বিচার সমাপ্ত হচ্ছে না দেখে পতিসেবাপরায়ণা উভয়ভারতী স্বামীর মধ্যাহ্ন আহার রন্ধনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এ যেন যুগপরম্পরায় ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা। মণ্ডন মিশ্র প্রভূত ঐশ্বর্যবান, উভয়ভারতীও বহু দাসদাসী পরিবৃতা ও বিদুষী, তবুও নিজহাতে তিনি স্বামীর জন্য রন্ধন করতেন। ভারতের পতিব্রতা রমণীর আদর্শ এমনই, পতিকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা। প্রতিমায় যদি ভগবানের পূজা হয়, তবে জীবন্ত মানুষে কেন হবে না? এছাড়া এতে পতিপত্নীর পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়, সুন্দর গার্হস্থ্যজীবন গড়ে ওঠে। দুপক্ষেই এই শ্রদ্ধা আবশ্যক।

মণ্ডন মিশ্র পরাজিত হওয়ার পর উভয়ভারতী শংকরাচার্যকে বলেন, ''আমার পতির পরাজয় এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। শাস্ত্রে আছে—'আত্মনোঽর্ধং পত্নী'। আগে আমাকে পরাজিত করে তারপর আমার পতিকে আপনার শিষ্য করুন।'' অপ্রত্যাশিত এই পরিস্থিতিতে শংকর একটু মৌন থেকে পরে বললেন, ''দেবী, যশস্বী পণ্ডিতগণ কখনও নারীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হন না।'' এতে অসন্তুষ্ট উভয়ভারতী বললেন, ''আপনি নারীকে কেন তুচ্ছ জ্ঞান করছেন? ঋষিশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর সঙ্গে, রাজর্ষি জনক সুলভার সঙ্গে বিচার করেছিলেন। আপনি আমার সঙ্গে কেন বিচার করবেন না? যদি বিচার না করেন তবে স্বীকার করুন আপনি পরাজিত।'' বাধ্য হয়ে আচার্য উভয়ভারতীর সঙ্গে বিচার শুরু করলেন। উভয়ভারতীর শত শত প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকলেন তিনি। বিচার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে লাগল, উভয়ভারতীর পাণ্ডিত্যের গভীরতা, বিচারভঙ্গি, বিশ্লেষণশক্তি ইত্যাদি দেখে উপস্থিত পণ্ডিতগণ বিস্মিত হলেন। এভাবে সতেরো দিন বিচারের পর আঠারো দিনের দিন উভয়ভারতী কামশাস্ত্র বিষয়ক কিছু প্রশ্ন করলেন, যেগুলির উত্তর সন্ন্যাসীর জানার কথা নয়। শংকর মাথা নিচু করে রইলেন, অনেকক্ষণ পরে বললেন, ''দেবী, আপনি শাস্ত্র বিষয়ক প্রশ্ন করুন, সন্ন্যাসীকে এই জাতীয় প্রশ্ন কেন করছেন?'' উভয়ভারতী বললেন, ''কেন যতিবর? কামশাস্ত্র কি

শাস্ত্র নয়? আপনি সর্বজ্ঞ হয়েও তো দিগ্বিজয়ের বাসনা ত্যাগ করেননি! এছাড়া আপনি যদি সিদ্ধ হন তবে তো জিতেন্দ্রিয়, তাহলে কামশাস্ত্র আলোচনায় আপনার চিত্তবিকার কেন হবে?" সন্ন্যাসিবর বিব্রত হচ্ছেন দেখে স্ত্রীকে মণ্ডন মিশ্র বলেন, ''সন্ন্যাসীকে এমন প্রশ্ন করে বিব্রত করা কি ঠিক হচ্ছে?" উভয়ভারতী নির্ভীকভাবে জানালেন, ''সন্ন্যাসীর জ্ঞানলাভের ফলে কামক্রোধাদি জয় করার কথা। কামশাস্ত্র আলোচনায় যদি চিত্তবিকার হয় তবে উনি আপনার গুরু হওয়ার যোগ্য নন।" আচার্য শংকর তখন শান্তভাবে বললেন, ''মা, সন্ন্যাসীর পক্ষে কামত্যাগ—এই তো শাস্ত্রের অনুশাসন। লোকসংগ্রহের জন্য শাস্ত্রের মর্যাদা দিতে হয়। আমি সন্ন্যাসীর আদর্শকে কলুষিত করব না। তাই একমাস সময় দিন, অন্যদেহে প্রবেশ করে আপনার প্রশ্নের লিখিত জবাব দেব।" উভয়ভারতী জিজ্ঞাসা করলেন, ''অন্যদেহে প্রবেশ করে কামচিন্তা করলে আপনি সন্ন্যাসধর্ম হতে চ্যুত হবেন না?" উত্তরে শংকর বলেন, ''পূর্বজন্মে চণ্ডাল পরজন্মে ব্রাহ্মণ হলে কি তার ব্রাহ্মণত্বের হানি হয়?"

এরপর শংকর এক মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করে কামশাস্ত্র অবগত হন এবং একমাস পর ফিরে এসে উভয়ভারতীকে লিখিত উত্তর দেন। সন্তুষ্ট উভয়ভারতী শংকরের জয় ঘোষণা করেন। মণ্ডনপত্নী বলেন, ''এখন আমার পতি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন আর আমি সমাধিতে দেহত্যাগ করব।" আচার্য শংকর নতজানু হয়ে উভয়ভারতীর চরণপ্রান্তে বসে বলেন, ''হে দেবী, আপনার জন্মরহস্য আমি জানি, আপনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যা বিতরণের জন্য দেহধারণ করেছেন। আপনি শরীর ত্যাগ করলে পৃথিবীতে জ্ঞানের অভাব দেখা দেবে। আমার ইচ্ছা শৃঙ্গেরীতে একটি মঠ স্থাপন করি, আর সেখানে আপনি অধিষ্ঠান করে জ্ঞান বিতরণ করুন।"

উত্তরে উভয়ভারতী বলেন, ''আমি দৈবশরীরে সেই আশ্রমে অবস্থান করব। আপনি সেখানে আমার নামে যন্ত্র স্থাপিত করুন।" এরপর উভয়ভারতী সমাধিতে শরীরত্যাগ করেন। স্ত্রীর সৎকারাদি ক্রিয়া সমাধা করে মণ্ডন মিশ্র শংকরাচার্যের কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা নেন—তাঁর নাম হয় সুরেশ্বরাচার্য।

বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা সরস্বতীই পৃথিবীতে জ্ঞান বিতরণের জন্য উভয়ভারতীরূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। মতান্তরে, তিনি দুর্বাসার শাপগ্রস্তা হয়ে মর্ত্যে জন্মেছিলেন। তাঁর জীবনে দেখি লোকশিক্ষার জন্য আদর্শ গৃহিণীর আচরণ। তিনি পরাজিত স্বামীর সম্মানরক্ষার জন্য অসমসাহসী হয়ে শ্রেষ্ঠ আচার্যের সঙ্গে বিচারে সম্মুখীন হতে ভয় পাননি। চোখের সামনে ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত স্বামীকে পরাজিত হতে দেখেও তিনি শংকরকে বিচারে আহ্বান করলেন, কারণ পতিব্রতার কর্তব্য স্বামীর সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী হওয়া। সেকালে এক নারী পুরুষসভায় বিচার করবে তা ছিল কল্পনাতীত। তাঁর বিচারণায় প্রবৃত্তি, বাচনভঙ্গি সবাইকে বিস্মিত করেছিল। এ তাঁর পাণ্ডিত্য ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয়। সন্ন্যাসী শংকর নারীর সঙ্গে বিচারে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করে ইতিহাসের উদাহরণ দেখিয়ে তাঁকে বিচারে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য করেন। তাঁর আত্মবিশ্বাস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহস শিক্ষণীয়।

স্বামীজী চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, পাশ্চাত্য ভোগবাদের অনুকরণ ছেড়ে প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতা ও পাশ্চাত্য প্রযুক্তির সমন্বয়ে ভারতের উন্নতি সাধন করতে। নারীজাতির উন্নতি ও ধর্মকে বাদ দিয়ে এদেশের উন্নতি অসম্ভব। তাই ভারতের নবীন প্রজন্মকে এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে অধিকতর পরিচয় করাতে হবে। উভয়ভারতীর মতো নারীদের জীবনই এযুগের নারীদের দেখাতে পারে নতুন দিশা, নতুন আলো, নতুন আশা। ✠

মাতঙ্গিনী হাজরা ও তমলুক রামকৃষ্ণ মিশন

নন্দগোপাল পাত্র

স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান মেদিনীপুর (অখণ্ড—বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম)। মেদিনীপুর জেলা সম্পর্কে দুটি মন্তব্য স্মরণযোগ্য। প্রথমটি ঐতিহাসিক আবুল ফজলের : 'বাংলার বারুদখানা'। তাঁর 'আইন-ই-আকবরী'তে এর উল্লেখ রয়েছে। অপরটি ব্রিটিশ সরকারের—'It is the land of revolt'—বিদ্রোহের দেশ বা ধাতৃভূমি। দুটি মন্তব্যই সত্য। স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার অবদান এখনও দীর্ঘ গবেষণার দাবি রাখে। শুধু সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনই নয়, অসহযোগ, আইন অমান্য এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে মেদিনীপুর।

এই জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের যোগদান ছিল ইতিহাসে এক মাইলফলক ঘটনা। মাতঙ্গিনী হাজরা সে-ইতিহাসেরই এক জ্বলন্ত বারুদ। তিনি রত্নপ্রসবিনী মেদিনীপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীরাঙ্গনা। স্বাধীনতা আন্দোলনে অসংখ্য মহীয়সী অগ্নিকন্যা আত্মবলি দিয়েছেন। তাঁরা সকলেই প্রণম্যা। কিন্তু মাতঙ্গিনী বহুলাংশে স্বতন্ত্র। কারণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সুশিক্ষিতা ছিলেন না তিনি। হতদরিদ্র পরিবারের সম্পূর্ণ নিরক্ষর এই কন্যা আঠারো বছর বয়সে বিধবা হয়েও যেভাবে তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তা ছিল সত্যিই বিস্ময়। গান্ধী আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলে 'গান্ধী বুড়ি' হিসেবেই পরিচিতি লাভ করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামী কমলা দাশগুপ্ত (১৯০৭-২০০০) লিখেছেন, ''গান্ধীজির প্রতি তাঁর বিশ্বাসের অন্ত ছিল না। এমনকি অসুখ করলেও তিনি ওষুধ খেতেন না। গান্ধীজির নামে 'সিন্নি জল' খেতেন—তাতেই নাকি তাঁর অসুখ সেরে যেত।''[১]

১৯৩০-এর ৬ এপ্রিল গান্ধিজী লবণ সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন। মাতঙ্গিনীর বাড়ির সামনে ১৯৩১-এ স্থাপিত হয়েছিল কংগ্রেসের একটি স্বেচ্ছাসেবক শিবির। চোখের সামনে ঘটত ওই শিবিরের নানা কর্মকাণ্ড, যা তাঁকে ১৯৩২-এ আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। আলিনান লবণকেন্দ্রে লবণ তৈরি করে আইনভঙ্গ করলেন তাঁরা। অন্য সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে মাতঙ্গিনীকেও গ্রেপ্তার করল পুলিশ এবং তাঁকে বহুদূর পথ হাঁটিয়ে

সহ শিক্ষক, দীঘা দেবেন্দ্রলাল জগবন্ধু শিক্ষাসদন, পূর্ব মেদিনীপুর

নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল। ওই বছর 'চৌকিদারি ট্যাক্স বন্ধ' আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে মাতঙ্গিনী অংশগ্রহণ করেন। এরপরের ঘটনা ১৯৩৩ সালের। তমলুকে লাটসাহেব জন আন্ডারসন দরবার করবেন। পুলিশ ও প্রশাসনের বেপরোয়া মনোভাব। বন্দেমাতরম্ ধ্বনির সঙ্গে আওয়াজ উঠল 'লাটসাহেব তুমি ফিরে যাও।' শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল দরবারের দিকে। পথ আটকাল পুলিশবাহিনী। পুরোভাগে ছিলেন মাতঙ্গিনী। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল। বিচার হল। মাতঙ্গিনী ছ-মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ফৌজদারি আদালতে বিচারক এ কে দত্তের রায় ঘোষণার পর মাতঙ্গিনী হাসিমুখে বলেন, ''দেশের জন্য, দেশকে ভালবাসার জন্য দণ্ডভোগ করার চেয়ে বড় গৌরব আর কি আছে?'' তিনি বন্দি ছিলেন বহরমপুর জেলে। সহবন্দিরূপে পেয়েছিলেন ইন্দুমতী ভট্টাচার্য, সুহাসিনী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উচ্চশিক্ষিত মহিলাদের। এরই ফলে নিষিদ্ধ তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্মেলনে ও ১৯৩৯-এ নাড়াজোলের রাজা দেবেন্দ্রলাল খানের মেদিনীপুর বাসভবনে জেলা মহিলা কংগ্রেসের সম্মেলনে তিনি অংশ নেন।[২]

মাতঙ্গিনী অমর হয়ে আছেন ১৯৪২-এর আগস্ট বিপ্লবের জন্য। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কংগ্রেস সদস্যরা মেদিনীপুরের সকল থানা ও সরকারি কার্যালয় দখলের পরিকল্পনা করেন। উদ্দেশ্য ছিল জেলা থেকে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা। ২৯ সেপ্টেম্বর তমলুক থানা, কোর্ট দখলের সিদ্ধান্ত হয়। ওইদিন বিকেল তিনটেয় তমলুক শহরের পাঁচ দিক থেকে পাঁচটি বিশাল মিছিল থানা ও কোর্টের দিকে এগোয়। উত্তরদিক থেকে আসা মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন মাতঙ্গিনী। তাঁর এক হাতে বিজয়শঙ্খ, অন্য হাতে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা। কোর্টের পেছনে বানপুকুর পাড়ে বিশাল ব্রিটিশ সেনাবাহিনী অহিংস জনতার মিছিলের পথ আটকে দাঁড়ায়। নেতৃত্বে ছিলেন পুলিশ অফিসার অনিল কুমার ভট্টাচার্য। আর এগোলেই গুলি করা হবে। এমন সময় হঠাৎই মাথুরি গ্রামের তেরো বছরের ছোট্ট রোগা ছেলে লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ছুটে গিয়ে এক ব্রিটিশ পুলিশের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিতে যায়। নির্মমভাবে প্রহৃত হয় সে। তার দিকে ধেয়ে আসা গুলি লাগে মাতঙ্গিনীর বাম হাতের কনুইতে। বাম হাতের শঙ্খ মাটিতে পড়ে যায়। অকুতোভয় মাতঙ্গিনী সে-আঘাত অগ্রাহ্য করে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে পতাকা ডান হাতে আঁকড়ে ধরে বানপুকুরের পাড় ধরে সৈন্য ব্যূহের দিকে এগোতে থাকেন আর সৈন্যদের উদ্দেশে বলতে থাকেন, ''গুলি চালানো বন্ধ করে, দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দাও।'' ব্রিটিশ সেনা আবার গুলি চালাল তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধার শরীর লক্ষ করে। তা বিদ্ধ হল তাঁর ডান হাতে। গুলিবিদ্ধ জখম দুটি হাত দিয়ে বুকের মাঝে পতাকাদণ্ডটিকে সন্তানসম আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলেছেন মাতঙ্গিনী, মুখে 'বন্দেমাতরম্', 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' ধ্বনি। কমলা দাশগুপ্ত লিখেছেন, ''তার উত্তরে আর একটি গুলি এসে তাঁর কপাল ভেদ করে চলে গেল। ভূলুণ্ঠিত রক্তাক্ত দেহের সেই প্রাণহীন হাতে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় তখনও উড়ছে জাতীয় পতাকা। সরকারি সৈন্য এসে সেই জাতীয় পতাকা ধূলায় লুটিয়ে দেয়।''

ব্রিটিশ শাসকের অমানবিক পুলিশ আরও ঘৃণ্য হিংস্রতার পরিচয় দিল। নিথর হয়ে পড়ে রইলেন মাতঙ্গিনী। সেদিন মাতঙ্গিনী হাজরা ছাড়াও তাঁর নেতৃত্বে মিছিলে ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে শহিদ হন—মাথুরি গ্রামের লক্ষ্মীনারায়ণ দাস (১৩ বছর), দ্বারিবেড়িয়ার পুরীমাধব প্রামাণিক (১৫ বছর), মাথুরির জীবনকৃষ্ণ বেরা (১৮ বছর), আলিনানের নগেন্দ্রনাথ সামন্ত (২৫বছর)। অন্য মিছিলগুলিতে শহিদ হয়েছিলেন কিয়াখালির রামচন্দ্র বেরা (৪৫

বছর), নিকাশীর বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী (২৫ বছর), পাইকপাড়ার ভূষণচন্দ্র জানা (৩৫ বছর), ঘাটুয়ালের পূর্ণচন্দ্র মাইতি (২২ বছর) ও নিরঞ্জন জানা (১৭ বছর), হিজলবেড়িয়ার নিরঞ্জন পাখিয়াল, খনিকের উপেন্দ্রনাথ জানা।[৩]

মতভেদ থাকলেও বিভিন্ন কারণে মাতঙ্গিনীর জন্মতারিখ হিসাবে মান্যতা পেয়েছে ১৯ অক্টোবর ১৮৭০ তারিখটি।[৪] জন্ম তমলুক থানার হোগলা গ্রামে। বাবা ছিলেন দরিদ্র কৃষক ঠাকুরদাস মাইতি। বারো বছর বয়সে মাতঙ্গিনীর বিয়ে হয় আলিনান গ্রামের ত্রিলোচন হাজরার সঙ্গে। ১৮৮৮-তে আঠারো বছর বয়সে তাঁর বৈধব্য জীবন শুরু হয়। সাধারণ কৃষকবাড়ির নিঃসন্তান নিরক্ষর বালবিধবা মাতঙ্গিনীর জীবনে তমলুক রামকৃষ্ণ মিশনের (প্রতিষ্ঠা ১৯১৪) যথেষ্ট প্রভাব ছিল। মিশনের শতবার্ষিকী গ্রন্থে পাই : ''মাতঙ্গিনীদেবী তমলুক শহরে মিটিং-এ যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর বাড়ি আলিনান গ্রাম থেকে যখনই আসতেন তখন তাঁর বাড়ির বাগানে উৎপন্ন তরিতরকারির দুটি বড় পোঁটলা সঙ্গে নিয়ে আসতেন। একটি পোঁটলা দিতেন তমলুকের অবিসংবাদিত নেতা শ্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে এবং অপরটি দিতেন তমলুকে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে।... এইভাবে মাঝেমাঝেই মিশনে যেতেন, সন্ন্যাসীদের মুখে পরমহংসদেব, শ্রীশ্রীমা, যুগাচার্য স্বামীজীর কথা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতেন।... ২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪২... মাতঙ্গিনীদেবী সহ মোট এগারো জন পুলিশ ও মিলিটারি সৈন্যের গুলিতে শহীদ হন। মৃতদেহগুলি ইংরেজ সরকার তাঁদের বাড়ির লোকজনদের হাতে তুলে না দিয়ে পায়রাটুঙ্গী মর্গে আটকে রাখে। তিনদিন ধরে পড়ে থাকা লাশঘরে স্তূপীকৃত মৃতদেহগুলি পচতে শুরু করেছে, কিন্তু সরকারের হুঁশ নেই। নিরুপায় জনগণও কিছু করতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত তমলুক রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিশোকাত্মানন্দজী তৎকালীন এ জি এম মি. মৃগাঙ্কমৌলি বসু (আই সি এস)-এর সঙ্গে গোপন বৈঠক করলেন। সিদ্ধান্ত হল মৃতদেহগুলি রাতের অন্ধকারে মর্গ থেকে তমলুক শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে এবং দাহ করা হবে। তৎকালীন এস ডি ও মি. ওয়াজির আলি শেখ (আই সি এস) পুলিশ ও মিলিটারি প্রহরার ব্যবস্থা করলেন।... দাহ হয়ে গেলে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের স্ত্রী ইন্দুমতীদেবী ও শ্রীযুত অশ্বিনী সিংহ মহাশয়ের স্ত্রী ফুলের সাজি ও খই নিয়ে এলেন এবং চিতার উপর তা ছড়িয়ে দিয়ে শ্রদ্ধাভরা প্রণাম জানালেন।''[৫]

মাতঙ্গিনী প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর নৈতিক শিক্ষা কোনও অংশে কম ছিল না। আজ সবথেকে বড় অসুখ নির্লিপ্ততা, আত্মকেন্দ্রিকতা—অপরের সমস্যা থেকে নিজেকে সুকৌশলে সরিয়ে রাখা। আমাদের নিজেদের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণের জন্য সমাজকে কলুষমুক্ত করতে হলে মাতঙ্গিনীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলকে, বিশেষত মেয়েদের সচেতন, সাহসী ও স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। তবেই উঠবে নতুন সূর্য, সার্থক হবে মাতঙ্গিনীদের আত্মবলিদান।

তথ্যসূত্র

১। *দেশ*, ১৭ অক্টোবর ২০২০, পৃঃ ১৮
২। *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান*, খণ্ড ১, ২০১০, পৃঃ ৫৬৪
৩। ড. রাসবিহারী পাল, অধ্যাপক হরিপদ মাইতি, *স্বাধীনতা সংগ্রামে মেদিনীপুর*, খণ্ড ৩, ১৯৯২, পৃঃ ১৩০-১৩২
৪। *দেশ*, ১৭ অক্টোবর ২০২০, পৃঃ ১৯
৫। '*শতবার্ষিকী*' (স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ এবং তমলুক রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা), ২০১৪, পৃঃ ৫৪

ব্যক্তিমনের সংকটে প্রকৃতির আশ্রয় : জীবনানন্দ দাশের কয়েকটি ছোটগল্প

দেবরূপা দাস

প্রকৃতিসচেতন কবি জীবনানন্দ দাশের কাব্যের একটি শক্তিশালী উপাদান সময় তথা অখণ্ড কালজ্ঞান। সময় ও সমসাময়িক ঘটনাবলি সামাজিক বদলকে সূচিত করে, জন্ম দেয় আধুনিকতার। আবার সামাজিক পরিবর্তন নির্ভর করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর। তাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য, আবেদন, উপস্থাপনা ও গতি কালে কালে বদলে যায়। সেখানে প্রতিফলিত হয় সমাজবাস্তবতা—মানুষের অস্তিত্ব-সংকটের কষ্ট-যন্ত্রণা-দ্বিধা। সাহিত্যিক তা থেকে বেরোনোর ইতিবাচক পথের সন্ধান দেন। ‘ঝরাপালক’, ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’, ‘বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থের কবি জীবনানন্দ দাশও চেতনার ভিন্নতর প্রকাশের মাধ্যম করে নিয়েছিলেন গদ্যকে। সামাজিক পরিবর্তনের যুগলক্ষণ আরও প্রকটভাবে ধরা পড়ে কবির মৃত্যুর বহু বছর পরে উদ্ধার হওয়া তাঁর প্রায় ১২৭টি ছোটগল্পে এবং প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রবন্ধে। তিনি বললেন, ‘‘নতুন সময়ের জন্য নতুন ও নতুনভাবে নির্ণীত পুরোনো মূল্যবোধ, নতুন চেতনা ও নতুনভাবে আবিষ্কৃত পুরোনো চেতনারও যে একান্ত দরকার শিল্পে ও জীবনে, এ-কালের কোনও বাঙালি কবি সেটা বুঝতে পেরেছেন বলেই আজকের বাংলা কবিতা স্বভাবতই বিষয় ও রীতি নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষার একটা অব্যাহত প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে।’’[১] এটি কথাসাহিত্যেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কল্লোলযুগের কথাসাহিত্যে স্থান পেতে থাকে মানবমনের সংকট, বাসনার কথা। জীবনানন্দ নিজেও কবিতার মতোই ছোটগল্পের বিষয়, আঙ্গিক ও উপস্থাপনা নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা করেছেন। সমকালীন পৃথিবী, সময়, সমাজের পরিবর্তন ও ব্যক্তিমনে তার প্রভাব শিল্পিত ভঙ্গিতে ধরা পড়েছে তাঁর গল্পগুলিতে। সীমিত পরিসরে তুলে ধরেছেন একের পর এক ক্লান্ত, অবসন্ন, নিঃসঙ্গ ব্যক্তি অস্তিত্বকে। কিন্তু সেখানেই তাদের ফেলে রাখেননি। নিসর্গজগতের একটি মূল্যমহিমা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর রচনায়—‘‘প্রকৃতির চির নবায়মান জীবনের স্ফূর্তি ও সৌন্দর্যই মানবজীবনের ক্লান্তি, বেদনা ও ‘রক্তআকাঙ্ক্ষার’ গ্লানি স্খলন করে দিতে পারে।’’[২] জীবনানন্দ সেই প্রত্যয়ে অস্থির নাবিকের মতো দিশাহীন অন্ধকারে আবর্তিত ব্যক্তিসত্তাকে প্রকৃতির অপরাজেয় প্রশান্তির

গবেষক, বাংলা বিভাগ, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন কলেজ

আশ্রয়ে বিশ্বাসী করে তোলেন। কারণ,

''সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে।
আমি চলে যাব বলে
চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
নরম গন্ধের ঢেউয়ে?
চারিদিকে শান্ত বাতি—ভিজে গন্ধ—মৃদু কলরব;
খেয়ানৌকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে;
পৃথিবীর এইসব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল...।''[৩]

এক

জীবনানন্দের ছোটগল্পে সমাজবাস্তবতা চিহ্নিত হয়েছে কতগুলি বিশেষ প্রেক্ষাপটে, যা চরিত্রের সংকটকে ঘনীভূত করে তুলেছে। গল্পগুলি লেখা হয়েছিল বিংশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে। তাই দুই বিশ্বযুদ্ধ-মধ্যবর্তী বিশ্বজোড়া সংকট তাঁর গল্পে যেমন প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনই আবার মন্বন্তর-দাঙ্গা-দেশভাগে সামাজিক অবক্ষয়ও ধরা পড়েছে। জীবনানন্দের গল্পে রাজনৈতিক বিষয় সেভাবে প্রকট হয়নি। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা উপনিবেশিত ভারতের কৃষিব্যবস্থা আর রপ্তানিকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে প্রবল আঘাত করে। 'কল্লোল' পত্রিকার সমাচার বিভাগের (চৈত্র ১৩৩০) একটি সংবাদ থেকে জানা যায়, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লাখ।[৪] সেই সংখ্যা বেড়েছিল অনেক। এসব কারণে শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনমানসে সংকট অবশ্যম্ভাবী। জীবনানন্দ নিজেও ১৯৩০ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত কর্মহীন ছিলেন। তাঁর এইসময়ের গল্পগুলির বেশিরভাগেই কেন্দ্রীয় চরিত্র শিক্ষিত, কবিমনোভাবাপন্ন ও উপার্জনহীন বেকার। ধনবণ্টনের নিরিখে শ্রেণিবৈষম্যও ব্যক্তিমানসকে বিপন্ন করে তাকে বিচ্ছিন্ন অসহায় করে তোলে।

পারিবারিক সম্পর্কের শিথিলতাও সংকটের কারণ। একান্নবর্তী পরিবারে উপার্জনহীন বেকার সদস্যের আদর থাকে না। কর্মজগতের স্থানান্তরের কারণে উপার্জনক্ষম সদস্য একান্নবর্তী পরিবার থেকে বেরিয়ে যায়। পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে অর্থ পারিবারিক সম্পর্ককে নির্ণয় করে। ফলত হারিয়ে যেতে থাকে কোমল মানবিক মূল্যবোধগুলি। পরিবারের নিবিড়তার আশ্রয়প্রার্থী মানবমন স্বাভাবিকভাবেই যন্ত্রণাদীর্ণ হয়। জীবনানন্দ মূলত এই যন্ত্রণার দিকগুলি তুলে ধরেছিলেন গদ্যে। মানব অস্তিত্বের জিজ্ঞাসাও সমাজ ও মনের সংঘাত থেকেই কবিতার 'বিপন্ন বিস্ময়' গল্পের চরিত্রদের তাড়া করে বেড়ায়। এই বিস্মিত বিপন্নতাই তাকে ক্লান্ত করে—একাকী করে তোলে। অস্তিবাদী দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্র বলেছেন, ''মানুষ তো শুধু শরীর নয়, দেহমনের যুক্ত সমবায়।''[৫] অদ্ভুতভাবে এই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় জীবনানন্দের 'মানুষের মুখের আভা' গল্পে প্রসন্নবাবুর মুখে : ''মানুষের জীবন তো তার শরীর নিয়েই না শুধু—হৃদয়ই যত বিচিত্র গোলমাল বাধায়। পড়ন্ত সূর্যের সোনালি রৌদ্রের ভিতর একজন কুৎসিত মানুষের মুখের ভিতরও কেমন একটা আভা দেখা যায়। সেই আভা নিয়েই জীবন, শরীর নিয়ে নয়।''[৬] বস্তুত, ব্যক্তির কর্ম বাস্তব জগতের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে যখন তার নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখনই তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যথায় তৈরি হয় বিপন্নতা।

বিপন্নতার আরও একটি কারণ পরিবারে নারীপুরুষের সম্পর্ক। ভালবাসা, সুস্থ দাম্পত্য, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বাধাপ্রাপ্ত হলেই আসে স্বার্থপরতা, তৈরি হয় আত্মিক সংকট। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আশা ও স্বপ্নের বাস্তবায়নে একজনের আত্মসুখসর্বস্বতা ভাঙন ধরায়। বাসনা বাধাপ্রাপ্ত হতে হতে অমুখর ব্যক্তিচরিত্র নিঃসঙ্গতায় নিমজ্জিত হয়। জাঁ পল সার্ত্র বলেছেন, ''ব্যক্তি যখন জীবনের এরকম সমস্যার সামনে দাঁড়ায়, তখন তার সমস্ত হৃদয় আবেগে মথিত হয়। আবেগ আন্দোলিত সত্তায় সে সিদ্ধান্ত নেয়।... সে এও অনুভব করে

তার সিদ্ধান্ত সফল নাও হতে পারে। এই অনিশ্চয়তা ও সফল না হওয়ার উদ্বেগ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঝুঁকি—এই সমস্ত অন্তর্মুখীনতার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি বুঝতে পারে সে আছে।... বাস্তব জগতের বিরোধের ফলে কোনও সিদ্ধান্তেই ব্যক্তি তৃপ্ত হতে পারে না।”[৭] ফলে ব্যক্তির মধ্যে উদ্বেগ ও আশঙ্কার জন্ম হয়। এভাবেই সংকট নৈরাশ্য সৃষ্টি করে। অর্থকষ্ট ও তজ্জনিত অসহায়তা বয়ে আনে অসম্মান, অপরাধবোধ ও গ্লানি।

দুই

জীবনানন্দ দাশের ছোটগল্পগুলিতে এই বিবিধ সংকট ও তার ফলে মানসিক দ্বন্দ্ব ধরা পড়েছে। গল্পগুলিতে উল্লেখযোগ্য প্লট না থাকলেও বিচ্ছিন্ন একাকী চরিত্রের টানাপোড়েন স্পষ্ট, স্বভাবপ্রকৃতির সহজাত আকাঙ্ক্ষাও মূর্ত হতে দেখা যায়। সমাজ-পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দাম্পত্যের শিথিল বন্ধন থেকে আশ্রয় খুঁজতে মানুষ তাই পান করতে চায় কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ সুঘ্রাণ। বাসনা জাগে ঘাসমায়ের কোলে ঘাস হয়ে জন্মাবার। কবি জীবনানন্দের কাব্যে প্রকৃতি একটি বিশেষ চরিত্র হয়ে উঠেছে—যে মনকে শান্ত করে, আশ্রয় দেয়, আত্মবিশ্বাসী করে। ‘কবিতার কথা’ প্রবন্ধে কবি জীবন ও কবিতার এক অসাধারণ সমীকরণ করেছেন : ‘‘কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুইরকম উৎসারণ; জীবন বলতে সচরাচর আমরা যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা প্রতিভা বা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণ ভাবে তৃপ্ত হয় না; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা-মনীষা শান্তিবোধ করে, পাঠকের ইমাজিনেশন তৃপ্তি পায়।”[৮]

কবিতা ও গদ্যের ব্যাবহারিক উপস্থাপনগত পার্থক্য আছে। ব্যক্তি, সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ও দ্বন্দ্বকে গদ্য ধরে রাখতে পারে, অন্যদিকে জীবন থেকে নিঃসৃত অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা ও কল্পনাকে ধারণ করে কবিতা। সব কবি-সাহিত্যিকই সমকাল সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তবে এর সঙ্গে চাই কল্পনা। ‘কবিতা সম্পর্কে’ প্রবন্ধে জীবনানন্দ লিখেছেন, ‘‘মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো... প্রকৃতি, সমাজ ও সময় অনুধ্যান কেউ কাউকে প্রায় নির্বিশেষে ছাড়িয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে না;... তবুও সময়-প্রসূতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থালাভ করতে চেষ্টা করেছি।”[৯] কবি আশাবাদী—অবসাদ বা হতাশার কবি তিনি নন। বরং অনেক বেশি জীবননিষ্ঠ তাঁর ভাবনা ও কল্পনা। তাঁর বিশ্বাস, ‘‘জীবনের ও বিশ্বসৃষ্টির রহস্য সবচেয়ে বেশি ব্যাপক হলেও, নিতান্ত লোকোত্তর কল্পনাও একজন মানুষের ভিতরেই দেখা দেয় বলে মানুষের সমাজে নিজেকে ফোটাতে গিয়ে তাকে বাস্তবাশ্রয়ী হতে হয়। ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়। এই চেতনা ও কল্পনাপ্রতিভা যাদের রয়েছে, তারাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করতে সমর্থ।”[১০]

সুতরাং নিজের ভাবনা অনুসারেই প্রকৃতি, সমাজ, সময় ও কল্পনা তাঁর গল্পগুলিতেও তিনি সমন্বিত করেছেন। তাঁর ছোটগল্পে কোথাও যেন বারবার কবি জীবনানন্দকে খুঁজে পাওয়া যায়। প্রকৃতি প্রতীক-সংকেত তাঁর প্রকৃতিচেতনাকে এমন এক অনন্যতা দিয়েছে, যা সমকালীন দেশি-বিদেশি বহু রচনাকারের লেখায় নেই। যে-প্রকৃতিজগৎকে তিনি কাব্যে নির্মাণ করেছেন তা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, উজ্জ্বল, তেমনই অনন্যপূর্ব। কবিতা থেকে গল্পে-উপন্যাসে এই প্রকৃতিজগৎ তাঁর নিজেরই ভিন্ন ভিন্ন মগ্নতার রঙে ও সুরে নতুন নতুনভাবে মূল্যায়িত হয়েছে। তিনি কবিতায় প্রকৃতির কিছু

অনুপুঙ্খ বর্ণনা এনেছিলেন, যেমন—'শিশিরের জল', 'শিশিরের গন্ধ', 'রৌদ্রের গন্ধ', 'ধানের গন্ধ', 'জলের গন্ধ', 'নক্ষত্রের আসা', 'মানুষীর মন', 'বেতের ফুলের মতো ম্লান চোখ', 'পাখির নীড়ের মতো চোখ', 'মধুকুপী ঘাস', 'মাদারের ডুমুরের সোঁদা গন্ধ', 'অন্ধকারে নুয়ে পড়া ঘাস', 'নরম সবুজ আলো', 'সুস্বাদ অন্ধকার', 'নক্ষত্রের রুপালি আগুনভরা রাত', 'আনন্দের আলোকের অন্ধকার', 'চাল-ধোয়া স্নিগ্ধ হাত', 'ধান মাখা চুল', বট-অশ্বত্থ-শিমূল-হিজল-জারুল। বুদ্ধদেব বসু সেই কারণেই তাঁকে আখ্যায়িত করেন 'প্রকৃতির কবি' নামে। গল্পেও অদ্ভুতভাবে লক্ষ করা যায় প্রকৃতির বলিষ্ঠ উপস্থিতি যেখানে জীবন-ক্লান্ত চরিত্ররা আশ্রয় খোঁজে, আশ্রয় পায়। জীবনানন্দ সপ্রতিভভাবে গল্পে আনলেন কতগুলি প্রাকৃতিক কাব্যিক উপমা, যেমন 'ঝিনুকের মতো ম্লান জ্যোৎস্নার আলো', 'হাতির দাঁতের মতো ধূসর নিঃসঙ্গ মুখ' ('কুড়ি বছর পরে'), 'নির্মল কাকাতুয়ার রাশির মতো শাদা হাওয়ার ভিড়', 'শরীরের রং মুমূর্ষু কার্তিকের ঘাসের মতো হলুদ' ('করুণার পথ ধরে')। বস্তুত প্রকৃতির কাছে এসে মানুষের মন এক অদ্ভুত শান্তি, প্রসন্নতা ও স্বাধীনতা লাভ করে। লতাগুল্ম-গাছপালা-পাখি-কীটপতঙ্গের বারবার উল্লেখের মাধ্যমে ''তারা হয়ে উঠেছে কবির কাছে প্রকৃতির প্রাণ ও প্রতীক, তারা হয়ে উঠেছে কবিহৃদয়ের স্বপ্ন ছেনে তৈরি এক অনির্বাণ ভেষজ জগৎ যেখানে অহংকারী মুহূর্তে পাওয়া যায় আনন্দ আর দুঃখিত মুহূর্তে পাওয়া যায় সান্ত্বনা ও শুশ্রূষা।''[১১]

তিন

জীবনানন্দের ছোটগল্পগুলি বাক্সবন্দি অবস্থায় উদ্ধার হয় তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পর। পাণ্ডুলিপিতে উল্লিখিত সাল থেকে গল্পগুলিকে তিনটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়—১৯৩৩ পর্যন্ত কালপর্বের গল্প, ১৯৩৬-এ রচিত গল্প এবং ১৯৪৬-৪৮ কালপর্বে রচিত গল্প। গল্পগুলিতে পরিবারস্থ মানুষদের পারস্পরিক সম্পর্কে স্থান-কাল প্রভাব ফেলে। যখনই গল্পের চরিত্ররা বাস্তবে বস্তুগতভাবে পরাজিত, ভগ্ন, তখনই তারা আশ্রয় খুঁজে নেয় প্রকৃতির। 'জামরুলতলা' গল্পের নায়ক দেশের বাড়িতে বিধবা পিসি ও অবিবাহিত কাকার সঙ্গে থাকে। স্ত্রী অনেকদিন হল শিশুকন্যাকে নিয়ে বাপের বাড়িতে। পরিবারের অন্যান্যরা কর্মসূত্রে কলকাতা ও অন্যত্র থাকে। দাদার পাঠানো সামান্য কুড়ি টাকায় ওই তিনজনের দিন চলে যায়। কথক নায়ক চরিত্রটি উপার্জনহীন, যোগ্য কাজ সে পায়নি। বয়স্ক মানুষগুলিকে একা রেখে কলকাতায় কাজের সন্ধান করাও অসম্ভব। গল্প লেখায় তার আগ্রহ। নিঃসঙ্গতা তাকে গ্রাস করে। তবু তার মনে হয়, ''মানুষ ভাত খেয়ে বাঁচে না শুধু। সে পুঁইশাকের চচ্চড়ি ও কুচো চিংড়ির ঘণ্ট খেতে পারে, কিন্তু চিন্তা ও কল্পনা তবুও তার। পশ্চিমের মেঘে সে সোনার সিংহ আবিষ্কার করতে পারে, অদৃশ্য সমুদ্রের শব্দ শুনতে পারে, ভোরের রাঙা সূর্যে অর্ধনারীশ্বরের ভয়াবহ সুন্দর রূপ দেখতে পারে।''[১২] জীবনানন্দ মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি ও তাদের অবিরাম সুদূরবিস্তৃত অসুরক্ষিত জীবনের দ্বন্দ্বকে তুলে আনতে চাইছেন। 'The Bengali Novel Today' প্রবন্ধে তিনি কথাসাহিত্যের সংকটগুলিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে-বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দাকে ব্যাখ্যা করেছেন তা তাঁর নিজের গল্পেও সমভাবে প্রযোজ্য।[১৩] এই হতশ্রী সময়ে দাঁড়িয়ে নায়কের 'হারানি'র কথা মনে হয়—ওই জামরুলতলায় সে আসত—নোনাগাছ থেকে ফল পাড়ত। একাকী নিঃসঙ্গতায় অতীত জীবনের স্মৃতি মনে আসে আর তখনই ''হৃদয়ের রং আশ্বিনের ঘাসের মত হয়ে ওঠে।'' বন্ধু নির্মলের অসুস্থ স্ত্রী শ্যামবাজারে ধনী মাসির বাড়িতে, সেখানেই সে মারা গেছে। জীবনের অসাফল্য, ক্লান্তি, অবসাদ তাকে লিখতেও আর উৎসাহিত

করে না—''কী লিখব। জীবনের বিপুল ব্যঙ্গ এসে আমার সমস্ত গল্পের পরিকল্পনাকে আঘাত দিয়ে যায়।''[১৪] ঠিক সেইসময়েই প্রকৃতিতে জীবনোল্লাস দেখে সে—''সবুজ পল্লবিত জারুলের ঐশ্বর্য, হেলিওট্রোপ রঙের ফুল, মেহেদীপাতার বনে স্বপ্নাতুর ঝিঁঝি, ছাতিমের ডালপালায় গাঙশালিক-গুলোর জীবনোচ্ছ্বাস, কৃষ্ণচূড়ার অজস্র কুঁড়ি, হারানির প্রেম, চারিদিককার সফল, প্রচুর, সজীব জীবনের কালীদহ কলরব...।'' প্রকৃতির এই জীবনোচ্ছ্বাস দেখার দৃষ্টিভঙ্গিও জীবনের প্রতি ইতিবাচকতারই প্রমাণ দেয়।

'অঘ্রাণের শীত' গল্পে গল্পকথক তার স্ত্রী উমার বহু আকাঙ্ক্ষিত কলকাতায় বাড়ি, স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ—কিছুই দিতে পারে না। দেড় বছরের শিশুসন্তানের জন্য নানা জিনিসের ফর্দ তৈরি করে রাখে উমা। কলকাতায় মেসে থেকে জীবিকার্জনের চেষ্টার ত্রুটি রাখে না কথক। দেশের বাড়ি গেলে পল্লিপ্রকৃতির সৌন্দর্যে —কীট-পতঙ্গ-পাখির জীবনতৃষ্ণায় সে আহ্লাদিত হয়। উমাকে নিয়ে হালদারদের পরিত্যক্ত ঘাটে বসে গল্প করে—প্রকৃতির গল্প—উমা প্রতিটি গাছের নাম জানতে চায়, বউ কথা কও পাখির নাম কেন এমন, জানতে চায়—হোগলার বনে শূন্য বাবুই পাখির বাসাটিও মমতাভরে ভাঙতে দেয় না। প্রকৃতির অনুষঙ্গে এই দম্পতির নিবিড় সংলগ্নতা গড়ে ওঠে। কিন্তু তবু জীবনে অসফল কথক—হেমন্তের পাকা ধান কাটার পর শুষ্ক ফাটলযুক্ত জমির মতোই তার আশাহীনতা। প্রকৃতিতেই সে তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি খোঁজে—''মস্ত বড় উঁচু জাম, অশ্বত্থগাছের ডালপালায় মাখা মাখা জোনাকির দল। এদের ভাষা ও গল্প জানবার জন্য সমস্ত জীবনটাকে উৎসর্গ করে ফেলতে ইচ্ছা করে। কয়েকটা শিশিরমাখা ঘাসের ওপর নেমে এসেছে, এদের আলোয় ঘাসের শিষ আবার মরকতের মতো সবুজ হয়ে উঠল। ঘাসের গোছার ভিতর কোথায় শ্যামাপোকা ঘুমিয়ে রয়েছে, কিংবা শুক জমেছে... কিংবা অন্যকোণে প্রেম বা স্বপ্ন জমে আছে জোনাকিরাই তা জানে। এদের নিস্তব্ধ জীবনের প্রবাহ শিল্প দেখি আমি, বড্ড স্নিগ্ধ ও সুন্দর। কোনও কোলাহল নেই কাড়াকাড়ি নেই, রক্তাক্ততা নেই।''[১৫]

ক্রমশ

তথ্যসূত্র

১। জীবনানন্দ দাশ, *সমগ্র প্রবন্ধ*, '*অসমাপ্ত আলোচনা*', প্রতিক্ষণ, কলকাতা, ২০০৯, পৃঃ ১১৯ [এরপর, *সমগ্র প্রবন্ধ*]

২। প্রদ্যুম্ন মিত্র, '*জীবনানন্দের প্রকৃতিজগৎ*', *জীবনানন্দ দাশ জীবন ও সাহিত্য*, সম্পাদনা : বিশ্বজিৎ ঘোষ ও মিজান রহমান, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃঃ ৬৯

৩। *জীবনানন্দ কবিতা সমগ্র*, 'সেই দিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি', রূপসী বাংলা, খণ্ড ১, নিউজ স্ক্রিপ্ট, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ ১৮১

৪। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৮, পৃঃ ১৪৭

৫। মৃণালকান্তি ভদ্র, *অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ*, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃঃ ১৬ [এরপর, *অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ*]

৬। জীবনানন্দ দাশ, '*মানুষের মুখের আভা*', *৩০টি গল্প*, প্রতিক্ষণ, ২০১৬, পৃঃ ২৬৭

৭। *অস্তিবাদ ও মানবতাবাদ*, পৃঃ ১১

৮। *সমগ্র প্রবন্ধ*, '*কবিতার কথা*', পৃঃ ২০

৯। তদেব, '*কবিতা সম্পর্কে*', পৃঃ ৪৭

১০। তদেব, '*একটুখানি*', পৃঃ ৪৬১

১১। তদেব, মঞ্জুভাষ মিত্র, '*চিত্ররূপময় বাংলার জানালায় রূপসী বাংলা ও জীবনানন্দ দাশ*', পৃঃ ৭৩

১২। জীবনানন্দ দাশ, *জামরুলতলা*, জীবনানন্দ দাশের ৫০টি গল্প, প্রতিক্ষণ, ২০১৬, পৃঃ ৮৯ [এরপর, *৫০টি গল্প*]

১৩। দ্রঃ *সমগ্র প্রবন্ধ*, '*The Bengali Novel Today*', পৃঃ ১৫৭

১৪। *৫০টি গল্প*, পৃঃ ৯৭

১৫। তদেব, '*অঘ্রানের শীত*', পৃঃ ৪৭০

বাংলা সাহিত্যে মালো জাতির প্রসঙ্গ

পিয়ালী দাস

সাহিত্যে বস্তুধর্মিতার গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গরূপে প্রান্তবর্গীয় জীবনের সন্ধান আধুনিকতার এক বিশেষ লক্ষণ। গত শতাব্দীর জনবিস্ফোরণ, মহাযুদ্ধ ও অর্থনৈতিক মন্দা সাহিত্যকে বিশেষভাবে বস্তুধর্মী করে তোলে এবং রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেশবিদেশের সাহিত্যে প্রান্তবর্গীয়দের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়। বাংলায় এই প্রান্তবর্গীয়দের অন্যতম উল্লেখ্য জনগোষ্ঠী হল মালো বা জেলে।

প্রাক্ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে

ঐতিহাসিক ড. নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন যে বারিবহুল, নদনদী-খালবিলবহুল প্রশান্ত মহাসাগরীয় সভ্যতা প্রভাবিত এবং আদি অস্ট্রেলীয় মূল বাংলায় মৎস্য অন্যতম প্রধান খাদ্যবস্তুরূপে পরিগণিত হবে, এটা কিছু আশ্চর্য নয়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে দেখা যায় ভরত রামচন্দ্রকে ফিরিয়ে নিতে এলে সঙ্গে করে দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, ফলমূল এবং ভাল মাছ—রুই, চিতল ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলেন। মালোদের আকৃতি, শারীরিক গঠন দেখে অনেকে বলেন তারা মল্লযুদ্ধে অংশগ্রহণ করত, তাদের মল্লযোদ্ধা বা মল্লবীর বলা হত। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ও লঙ্কাকাণ্ডে মল্লযোদ্ধার সংবাদ পাওয়া যায়। তখন রাজায় রাজায় মল্লযুদ্ধ হত, যেমন বালি ও সুগ্রীবের ক্ষেত্রে দেখা যায়। 'পদ্মপুরাণ' কাব্যে চাঁদ সদাগরের দক্ষিণ পাটন গমন অংশে কৈবর্ত অর্থাৎ জেলেদের প্রসঙ্গ আছে। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে মল্লযোদ্ধার কথা আছে। এরা ছিল অসাধারণ শক্তিশালী। চেহারা ও ক্ষমতায় এদের সঙ্গে যমদূতের মিল ছিল বলে কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'তে বলেছেন,

"দোসর যমের দূত, বৈসে যত রাজপুত,
মল্ল বৈসে রাজচক্রবর্ত্তী।"

ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে 'ঢেকুর পালায়' কেওট-এর পরিচয় পাওয়া যায়। বীরভূমের কথ্যভাষায় এই কেওট শব্দের অর্থ জেলে। ইছাই ঘোষ ঢেকুর গড় প্রতিষ্ঠা করলে কেওট বা কৈবর্তরা এসে বসতি স্থাপন করে। এদের বৃত্তি ছিল মাছ ধরা।

গবেষক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

কথাসাহিত্যে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে একটি প্রান্তিক সমাজের সকল বৈচিত্র্যকে ধারণ করতে চেয়েছেন। জেলেদের দারিদ্র্য, চিন্তা, পাশবিকতা, বিশ্বাস, সরলতা, নীচতা—এককথায় সামগ্রিক জীবনাচরণ এতে স্থান পেয়েছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘‘উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইতেছে ইহার সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণিঅধ্যুষিত গ্রাম্যজীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিতি-বোধ, ইহার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তিগুলোর ক্ষুদ্র সংঘাত ও মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমানির্দেশ। এই ধীবরপল্লীর জীবনযাত্রায় শিক্ষিত আভিজাত্যের মার্জিত রুচি ও উচ্চ আদর্শবাদের ছায়াপাত হয় নাই।... ইহার অধিবাসীদের ঈর্ষা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রীতি-সমবেদনা, চক্রান্ত-দলাদলি সমস্তই বাহিরের মধ্যবর্তিতা ছাড়া নিজ-প্রকৃতি-নির্ধারিত, সংকীর্ণ কক্ষপথে আবর্তিত হইয়াছে।’’[১]

জেলেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সামান্য, অল্পেই তারা তুষ্ট, তবু সেটুকুই তাদের ভাগ্যে জোটে না। তাদের ওপর আছে অপেক্ষাকৃত ধনীদের বঞ্চনা, পদ্মার উদাসীনতা আর প্রকৃতির অমোঘ অভিসম্পাত। সারাবছর পদ্মা তার তীরবর্তী অধিবাসীদের সুখে রাখতে পারে না। বিশেষ করে ইলিশের মরসুম ফুরিয়ে গেলে জীবনধারণ তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। পদ্মার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে জেলেপল্লীর জীবনপদ্ধতি। কেউ পদ্মার বুকে জাল ফেলে বেড়ায়, কেউ মাঝিগিরি করে, কেউ কুঁড়োজাল নিয়ে খালে দিন কাটায়। বর্ষায় পদ্মাপাড়ের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

‘পদ্মানদীর মাঝি’তে মূলত সাধু ভাষা ব্যবহৃত হলেও সর্বনামপদের ক্ষেত্রে লেখক প্রায়ই চলিত রীতির আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন—‘‘এ নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি। জালটাও তারই। প্রতি রাত্রে যত মাছ ধরা হয় তার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের, বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের। নৌকা এবং জালের মালিক বলিয়া ধনঞ্জয় পরিশ্রমও করে কম। আগাগোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে।’’[৩] এভাবে প্রায়ই এ-উপন্যাসে সাধু-চলিতের মিশ্রণ ঘটেছে।

উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষাদির ব্যবহারে নদী ও তার পারিপার্শ্ব নানাভাবে ছায়া ফেলে জেলে-মাঝিদের সংলাপে। ‘পদ্মানদীর মাঝি’র অধিকাংশ চরিত্র যেহেতু জেলে, সেহেতু তাদের সংলাপে নদী ও তার অনুষঙ্গ এসেছে। কপিলাকে দেখে কুবেরের মনে জেগেছে বর্ষায় ভরা-পদ্মার ছবি। কপিলার নির্মম দুর্বোধ্য আচরণ তার চোখে উপমিত হয়েছে পদ্মার রহস্যকুটিল আচরণের সঙ্গে।

তিতাসপাড়ের মালোদের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, সভ্যতা-সংস্কৃতি, শোষণ-বিড়ম্বনা, দুঃখ-উল্লাস-দ্রোহ—এককথায় মালোসমাজের অতীত ও বর্তমান প্রাণস্পন্দনের হদিস মেলে অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসে। মালোজীবনের অতল থেকে লেখক বহুমূল্যবান অরূপরতন তুলে এনেছেন। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দৈবনির্ভরতা তাদের জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছে। মালোরা সম্পূর্ণভাবে শোষিত এক সম্প্রদায়। মাছধরার মতো আদিম উপজীবিকার ওপর নির্ভরশীল মালোগোষ্ঠীকে প্রাকৃতিক শক্তির পাশাপাশি দাদনদার মহাজন, আড়তদার থেকে শুরু করে সাধারণ ক্রেতা পর্যন্ত সকলের মিলিত শোষণচক্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়। মালোরা মাছ ধরতে গিয়ে প্রকৃতির দুর্বিপাকে পড়ে মরে গিয়েও মরে না, তারা শুধু নিখোঁজ হয়। আর তাদের স্ত্রীদের তখন দুর্গতির শেষ থাকে না।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ বিপুল ভালবাসা দিয়ে মালো জনজীবনের সীমাহীন দুঃখ ও বুকভরা আর্তিকে

সাজিয়েছেন। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-উপন্যাসকে যতই 'নদীর পাঁচালি' বলুন না কেন, লেখকের নৈপুণ্যে এ হয়ে উঠেছে মালোজীবনের মহাকাব্য।

সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাস নদী থেকে সমুদ্রে যাওয়ার আখ্যান। যাদের জীবনের অধিকাংশই কাটে জলে, তাদেরই জীবন ও সমাজব্যবস্থা এখানে চিত্রিত। শুভঙ্কর ঘোষ লিখেছেন, ''সমরেশ বসু 'গঙ্গা'য় মাছমারাদের বাঁচার লড়াই চিত্রিত করেছেন।... অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য মাছমারাদের সঙ্গে গঙ্গায় ঘুরে বেরিয়েছেন। এটি কেবল জীবনচিত্রণ নয়, জীবনবোধের কথাশিল্প।''[২]

এই উপন্যাসে দেখা যায় বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের মাছমারা গঙ্গায় এসে ভিড় করেছে। গঙ্গার সঙ্গেই তাদের টিকে থাকার সম্পর্ক। তাদের ভাত-কাপড় বাঁধা আছে গঙ্গার কাছে। গঙ্গাও তার বুকে সবাইকে ঠাঁই দিয়েছে। মাছের মরসুমে ওপার অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান থেকেও জেলেরা এসেছে। গঙ্গার মতো সরকার ও সুদখোর মহাজনের কাছেও মালোজীবন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। মালোদের জালে মাছ না পড়লে দারিদ্র্যের কশাঘাত, আর পড়লে মহাজন-আড়তদার থেকে শুরু করে ছোট পাইকার-ফড়েনিদেরও প্রতারণা।

নিবারণের চেহারায় মালো জনগোষ্ঠীর আদিম শারীরিক বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্ট করেছেন লেখক। কালো কুচকুচে রং, পেটানো শরীর নেহাইয়ের মতো শক্ত। যেন নিমকাঠের কালো রংমাখা চকচকে মূর্তি। কেউটে সাপ যেন ফণা ধরে আছে। ভেড়ার লোমের মতো কালো কোঁকড়ানো চুল। যেন জাতসাপের ডিম ফোটা শালুই কিলবিল করছে মাথায়। হাসতে গেলে চোখ ঢেকে যায়। দেখে মনে হয় চোখ নেই, নাক নেই, খালি এক মুখ হাসি। বাদার মালোদের প্রথম পুরুষের গায়ের রঙও ছিল কালো কুচকুচে। এই প্রথম পুরুষেরই গাত্রবর্ণ ধারণ করে আছে পরবর্তী মালোরা। প্রথম পুরুষের দ্রোহী মনোভাব বর্তমান মালোদের রক্তেও বইছে।

দুঃখ-কষ্ট-দারিদ্র্যের ভেতরও জেলেদের জীবনে উৎসবের ছোঁয়া লাগে। 'গঙ্গা' উপন্যাসে জেলেদের নানা উৎসব, অনুষ্ঠান, বিশ্বাস, সংস্কার, প্রথা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। তার একটি হল 'বাচখেলা'—নদীতে বাছাড়ি নৌকার প্রতিযোগিতা। নদীনির্ভর জীবনে এ এক বিশিষ্ট আনন্দানুষ্ঠান।

জেলেদের জীবিকা ও জীবনবিশ্বাসের মধ্যে বার বার মৃত্যুবোধ উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। প্রতিপদে মৃত্যুভয় আছে জেনেও তারা বৃত্তিবদল করেনি, নদীকে ত্যাগ করেনি। মরণের ভয় তাদের নেই। মরণ ও মারণই তাদের প্রত্যক্ষ জীবনের পথ। এই জীবনবোধের নিরিখে মালো জনজীবন স্বতন্ত্র স্বাদযুক্ত হয়ে 'গঙ্গা' উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' ছোটমাপের একটি উপন্যাস। সুন্দরবন অঞ্চলের মালোদের জীবন, স্বপ্ন ও সংগ্রাম এখানে সংহত ভাষায় বিবৃত। মহাজনের কাছ থেকে দাদন-নেওয়া গরিব মালোরা তাদের পরিশ্রমের ফসল ঘরে তুলতে পারে না। ঋণ দেওয়ার অজুহাতে খটিদাররা তাদের ধৃত জলশস্য জলের দরে নিয়ে নেয়। খটি অর্থাৎ মাছের আড়ত। খটিদাররাই মালোদের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রক। 'গহিন গাঙ'-এ মালোসমাজের প্রবল প্রতিপক্ষ প্রকৃতি নয়, এইসব মানুষ। এদের পায়ের তলায় পিষ্ট হয় মালোদের আশা-অভীপ্সা। এদের অঙ্গুলি সংকেতে তাদের জীবনে ঝড় ওঠে, এদের ষড়যন্ত্রে নিরপরাধ মালো খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়। ঋণ নিয়ে এরা নৌকা-জাল কেনে। বছর বছর সুদে আসলে চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণ বাড়ে। মালোরা এই ঋণের জাল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না কখনও। তাদের দীনতার ছাপ শুধু আহারে নয়, পোশাকেও। অপঘাতে ললিতের মৃত্যুর পর মধু, হারান ও শ্রীপদ নৌকা নিয়ে বেতনা নদী বেয়ে বাড়ি ফিরছে। ছইয়ের ভেতরে পিতৃহারা অবসন্ন

শ্রীপদ বসে আছে। মধু আর হারান দাঁড় টানছে। তাদের পরনে ছেঁড়া নেকড়া, খালি গা।

উপন্যাসটির শেষে কোনও আশাবাদের ইঙ্গিত নেই। শ্রীপদর সংগ্রামী মানসিকতাকেই লেখক পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দিয়েছেন মাত্র।

শওকত ওসমানের লেখা 'সৌদামিনী মালো' গল্পে সৌদামিনী মালো নামে চার্চের সিস্টার মারা যাওয়ার পর চার্চ তার সম্পত্তি নিলাম করছে। তার স্বামী জগদীশ মারা যাওয়ার পর তার জেঠতুতো দাদা মনোরঞ্জন এই নিঃসন্তান দম্পতির বিপুল সম্পত্তি দখলের চেষ্টা করেছিল কিন্তু সৌদামিনীর তেজের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছিল। এরপর সৌদামিনী বছর দুয়েকের একটি শিশুকে নিয়ে আসে। তার নাম হরিদাস। মনোরঞ্জনের চক্রান্তে গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করে হরিদাস ব্রাহ্মণ, তার জাত মেরেছে শূদ্রাণী সৌদামিনী। সৌদামিনী হলফ করে বলে হরিদাস শূদ্র। পরে কয়েকজন তার বাড়িতে হামলা করলে সে জানায় যে হরিদাস শূদ্র বা ব্রাহ্মণ কিছুই নয়, সে আসলে মুসলমান। এরপর হরিদাস বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেলে সৌদামিনী খ্রিস্টান হয়ে যায়, সব সম্পত্তি মিশনের নামে লিখে দেয়। কিন্তু হরিদাসকে হারানোর যন্ত্রণায় সে পাগল হয়ে যায়।

কাব্যে

জসীম উদ্দীনের 'মাটির কান্না' কাব্যগ্রন্থের 'জলের কন্যা' কবিতায় আছে জেলেবউয়ের কথা : ''পুরাতন জালে তালি দিতে দিতে ঢলিয়া জেলের গায়,/ জেলে বো'র মন মিহিসুরি গানে উজানীর বাঁকে ধায়।'' ঝর্ণা বর্মণ তাঁর 'স্বপ্নের তিতাস' কবিতায় বলেছেন যে তিতাস জীবনের ছবি আঁকে। অকূল গাঙে যারা নৌকা ভাসায়, বাড়িঘর প্রিয়জন ছেড়ে নতুন করে ঘর তৈরি করে জলের ভিতে, সেইসব খেটে-খাওয়া মানুষ তিতাসের পাড়ে একে একে ভিড় করে। ঘাটে ঘাটে অকথিত জীবনের কত গাথা তৈরি হয়। তিনি অদ্বৈত মল্লবর্মণের কথাও বলেছেন। তাঁর শরীরে রাজরোগ, তবু অকুতোভয়ে দৃঢ়হাতে লিখে গিয়েছিলেন নিপীড়িত মানুষের কথা। তিতাস শুকিয়ে গেলেও তার বুকভরা জল, তিতাসকে কেন্দ্র করে রঙিন মিষ্টি স্বপ্নেরা ঘুরে ঘুরে আসে, জলের মতো কলকলিয়ে কথা বলে।

লক্ষ্মণ কুমার হালদার 'রাজমুকুট' কবিতায় অদ্বৈত মল্লবর্মণকে উদ্দেশ করে লিখেছেন,

''মল্লবীরের জয়গান গাহিয়াছ তুমি আজ নাই।
তবু এত নাম তিতাস নদীর নামে আমরা অমর।
তুমিও রেখেছ কৃতি কৃত্তিবাস সম হে বন্ধু মহান;
তুমি যে অজেয় তাই তোমারে স্মরিয়া
ভরে ওঠে প্রাণ।''

নাটকে

উৎপল দত্ত 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত নাট্যদল 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' মিনার্ভা থিয়েটারে নাটকটি মঞ্চস্থ করার পর বিভিন্ন মহলে সাড়া পড়ে যায়। ১৯৬৩ সালের ১০ মার্চ থেকে টানা সাতদিন নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। অভিনেতারা অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। এ-নাটকে মালোদের নাচগান, বেশভূষা, ভাষা, আঞ্চলিক কথার টান সবই আশ্চর্য বাস্তবতার সঙ্গে দেখানো হয়েছিল। তাছাড়া মঞ্চ উপস্থাপনা ছিল উৎপল দত্তের এক অভিনব কীর্তি। অভিনয়ের আসর ছিল সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে। প্রেক্ষাগৃহের মাঝের পথের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে অন্তত দু-ফুট চওড়া বেদি মঞ্চের সঙ্গে সামঞ্জস্য-পূর্ণভাবে নির্মিত হয়েছিল। সেখানে অভিনেতাদের আনাগোনা, রামকেশবের বাড়ি, ব্রতপালনের গান গেয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে কোথাও যেন দর্শক ও নটনটীদের ব্যবধান কমে গিয়েছিল। দর্শক অনুভব করত সে তিতাস নদীর পাড়েই বসে আছে। মালোজীবনের সঙ্গেও সে একাত্মতা অনুভব করত।

১৯৮৩ সালে উৎপল দত্ত রচনা করেছিলেন একটি দলিল নাটক—'মালোপাড়ার মা'। রতুয়া থানার মালোপাড়ায় বীভৎস কমিউনিস্ট হত্যাকাণ্ড অবলম্বনে এই নাটক। এ-নাটক কোনও কাল্পনিক ঘটনা বা সংবাদপত্রের প্রতিবেদনকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠেনি। উৎপল দত্ত নিজে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গ্রামে গিয়ে আক্রান্ত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেছেন, সরেজমিনে ঘুরে দেখেছেন, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ নিয়েছেন, পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট ও আদালতে সাক্ষীদের প্রদত্ত বয়ান সংগ্রহ করেছেন। 'মালোপাড়ার মা' প্রযোজনা মালদহ তো বটেই, সারা বাংলায় অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

প্রবন্ধসাহিত্যে এবং জীবনীগ্রন্থে

'গঙ্গার ইলিশ ও নদনদীর ইতিকথা' শীর্ষক সংক্ষিপ্ত রচনায় লক্ষ্মণ কুমার হালদার ইলিশ মাছের জন্মকথা, গতিবিধি ও জন্মস্থানের পরিচয় তুলে ধরেছেন। ইলিশ সমুদ্রের মাছ। বর্ষাকালে ইলিশ মিষ্টি জলের খোঁজে বড় বড় নদী যেমন গঙ্গা বা পদ্মা ও তার উপনদীতে ছড়িয়ে পড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা হলে ইলিশ দলবদ্ধভাবে সমুদ্রে পাড়ি দেয়। ইলিশ ছিল বাংলার মৎস্যজীবীদের আয়ের প্রধান উৎস। কিন্তু নানান বাঁধ নির্মাণ ও নদীর নাব্যতা হ্রাস হেতু এবং জলদূষণের কারণে ইলিশের আনাগোনা গঙ্গা বা তার উপনদীতে নেই বললেই চলে। গঙ্গার ইলিশের অপ্রতুলতা ও প্রতিবন্ধকতার দিকগুলি লেখক তুলে ধরেছেন। নদীর স্রোত বন্ধ করে দিয়ে এখন বিল, জলাশয়গুলোয় ইলিশ ছাড়া অন্যান্য মাছের উৎপাদন হচ্ছে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে। বাংলার নদীগুলি হেজে মজে গিয়ে, নাব্যতা হারিয়ে যেমন মৃতপ্রায় তেমনই নদীর সন্তান মৎস্যজীবীরাও মৃতপ্রায়।

'আলো-আঁধারি' (২০০৪) এবং 'ঈষৎ রূপান্তর' (২০০৮) বই দুটির লেখিকা বেবী হালদারের নাম আজ সচেতন পাঠকের কাছে অপরিচিত নয়। তিনি নিজেও মালো। মেধা পাটেকর তাঁকে বলেছেন 'মেহনতি সমাজের প্রতিনিধি'। অখ্যাত, অবজ্ঞাত, অবহেলিত, নির্যাতিত 'কাজের মেয়ে' বেবী আজ নিজেকে ছাপিয়ে উঠেছেন এমন একটা জগতে, যে-জগতের কথা তিনি কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। এ যেন ঘুঁটেকুড়ুনি মেয়ের রাজরানি হওয়ার গল্প। প্রথম গ্রন্থের তুলনায় দ্বিতীয় গ্রন্থটি সাবলীল। এইসময় বেবী সফল লেখিকা।

অনিতা অগ্নিহোত্রী তাঁর 'আমরা বেবীর পথ চলার সঙ্গী' রচনায় বলেছেন, বেবীর 'ঘরে ফেরার পথ' বইটি পাঠকের অপেক্ষাকৃত বেশি চেনা। ২০০২-তে 'আলো-আঁধারি' প্রকাশের মধ্য দিয়ে বেবীর যে-আত্মপ্রকাশের যাত্রা শুরু হয়েছিল, ২০১৪-তে এসে তা প্রায় পূর্ণ। দেশবিদেশ ঘুরে বিশ্বপরিচয়ের আলো মুকুটে নিয়ে বেবী এসেছেন ছোটবেলার পাড়া জলঙ্গি এবং দুর্গাপুরে। চেনা মানুষদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে দু-দশক পর। রাস্তাঘাট, দোকানপাট, মানুষজনের কথা নতুন করে লিখছেন এমন একজন মেয়ে, যাঁর মানুষের সঙ্গে নিজেকে মেলানোর আগ্রহ একটুও বদলায়নি। তাঁর পাড়ার ছেলেমেয়েরা বেবীর জীবনকাহিনি পড়ছে পাঠ্যবইতে, অথচ বেবী তাদের বাবা-মায়েদের অনেক দিনের চেনা মানুষ।

এই আলোচনা থেকে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মালো জাতির প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে তার একটি ধারণা পাওয়া যাবে। ✠

তথ্যসূত্র

১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮০, পৃঃ ৭৭০

২। শুভঙ্কর ঘোষ, *নদী : বাংলা উপন্যাস* '*নীললোহিত*' বিশেষ নদীসংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃঃ ১৪১

অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি

প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণা

পাহাড়ি গ্রাম। আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামের কোল ঘেঁষে পাহাড় বেয়ে চড়াই উৎরাই জুড়ে ঘন জঙ্গল। বলিষ্ঠ পুরুষদের সবসময় সতর্ক থাকতে হয় যাতে কোনও বন্যপশুর অতর্কিত আক্রমণে কারও ক্ষতি না হয়ে যায়। কোন প্রাচীনকালে গ্রামের প্রবীণরা স্থির করেছিলেন, একটা সুরক্ষাবাহিনী এই উদ্দেশ্যেই তৈরি থাকবে, যারা গ্রামকে রক্ষা করবে বাইরের শত্রু, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং পশুদের আক্রমণ থেকে। এই 'পাহারা দল'-এ সামিল হতে পারা অত্যন্ত গর্বের। সেজন্য একটি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়—সকলে নির্বাচিত হতে পারে না। সেইসব যোদ্ধা বীরদের অন্য চোখে দেখে সমাজ। অনেক বাবা-মায়েরাই বলবান পুরুষশিশুকে অনুপ্রেরণা দেয়, যাতে তারা পাহারা দলে যোগ দেওয়ার গৌরব অর্জন করতে পারে।

গ্রামে একটি বড় মাঠের ধারে লম্বা গাছটা রংপার খুব প্রিয়। মাঝে মাঝে খেলতে আসে। এখন জঙ্গলে ঢুকে কাঠ আনার সময়। দুপুরবেলা—সূর্যের তেজ খুব বেশি। কিন্তু রংপা ওই দুপুর রোদেই প্রিয় গাছের একটি ডালে বসে আছে চুপচাপ, শুধু খুব জোরে জোরে পা দোলাচ্ছে। ''ভয় করছে?''—পিঠে পরিচিত হাতের স্পর্শ। খুড়তুতো ভাই সিম্বা তাকে খুঁজতে এসেছে। তাকে কাজে আসতে না দেখে ঠিক জায়গাতেই অনুসন্ধান করেছে সিম্বা। রংপার ভয় পাওয়া উচিত নয়, কিন্তু কিছুতেই উদ্বেগটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না সে। গতকাল চাঁদের চতুর্দশীতে তার তেরো বছর পূর্ণ হয়েছে। আজ সেই পরীক্ষার দিন। রংপা খুব সাহসী, বড় নরম মন তার। যে কোনও বিপদ-আপদে সবাইকে সাহায্য করতে ছুটে যায়। একটু বড় হতেই সকলে বলাবলি করতে শুরু করে—''রংপাকে দলে নিতে হবে।'' মার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বাবা নিজে গ্রামের 'পাহারা দল'-এর খুব বড় সদস্য। তিনি চান, তাঁর ছেলেও একই গৌরব অর্জন করুক।

পরীক্ষাটি বড় অদ্ভুত। তেরো বছর পূর্ণ হলে সেই কিশোরকে চোখ বেঁধে জঙ্গলের ভেতরে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে দিয়ে আসা হয় সন্ধ্যাবেলায়। সারারাত সে একা সেখানে থাকে।

অধ্যক্ষা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন কলেজ

হিংস্র শ্বাপদসংকুল সেই অরণ্যে চোখ না খুলে, নির্ভয়ে সে যদি রাত কাটিয়ে জীবিত ফিরতে পারে এবং এই ভয়ের মুখোমুখি হওয়ার পরও সে প্রতিজ্ঞা করে যে এর চেয়েও ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মোকাবিলা করতে সে প্রস্তুত থাকবে, তাহলেই কেবল তাকে দলভুক্ত করা হয় এবং সত্যিই সারাজীবন বহু চড়াই-উৎরাই ডিঙিয়ে সকলকে রক্ষা করার দায়িত্ব তাকে কাঁধে তুলে নিতে হয়। সবটাই হতে হবে স্বেচ্ছায় এবং সাগ্রহে।

বিকেল গড়িয়ে যায়—প্রস্তুত হচ্ছে রংপা। মা খেতে দেয়। মার দিকে তাকাতে পারে না সে—সে নিশ্চিত জানে, মা কাঁদছে। মাকে দেখলে তারও চোখে জল আসবে। কঠিন মুখে বাবা পায়চারি করছেন। মুখ ভাবলেশশূন্য। তিনিই পুত্রকে নিয়ে যাবেন পরীক্ষাক্ষেত্রে। গ্রামের মানুষ একে একে এসে জমায়েত হয়। কেউ কোনও কথা বলছে না। এটাই রেওয়াজ। উৎসাহদান বা শোকপ্রকাশ—কিছুই করা চলবে না। সাহস আসবে পরীক্ষার্থীর মনের গভীর থেকে। রংপার চোখ বেঁধে দিলেন বাবা। ঘন অন্ধকার চোখের পাতায়—হাত ধরেছেন বাবা—হ্যাঁচকা টান পড়ল হাতে। ধীরে ধীরে রংপা চলতে শুরু করল। একটু অবাক লাগে—বাবা তাকে এত ভালবাসেন, কিন্তু হাতে ধরে কীভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছেন? সে তো নাও ফিরতে পারে, তাহলে? বাবার ভয় করছে না? বাবার দৃঢ়মুষ্টির বন্ধনে তার ডান হাতটি। রংপা এগিয়ে চলল নিঃশব্দে। বাবার নির্দয় ব্যবহারে বুকের মধ্যে দলা পাকিয়ে ওঠে অভিমান। সে তো ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে যে সে নাকি 'পাহারা দলে' স্থান পাওয়ার যোগ্য। কত গর্বের চোখে দেখে সবাই এই দলের মানুষদের। তার স্বপ্ন ছিল যে সে 'যোদ্ধা' হয়ে নিজের এবং অন্যদের যেকোনও বিপদে পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু এত অন্ধকারে অসহায় চোখবাঁধা অবস্থায় তাকে জঙ্গলে হিংস্র পশুদের মধ্যে ছেড়ে দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—তার ভয় হয়, বাবার আবেগহীনতায় তার কষ্ট হয়। চোখের জলকে প্রাণপণে গিলে ফেলে সে। না, কোনও আবেগ প্রকাশ করা চলবে না।

একটি বিশাল প্রস্তরখণ্ডের নিচে তাকে বসিয়ে দেন বাবা। মাথার ওপর খোলা ছাদ, কিন্তু পাথরটি তাকে ঝড়বৃষ্টি থেকে কিছুটা হলেও আড়াল করবে। এবার তার মাথায় হাত রেখে তিনি শুধু বললেন, ''আমি আসছি।'' আর কোনও কথা নয়। বাবার পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে দূর থেকে আরও দূরে মিলিয়ে গেল। দুর্জয় ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল রংপার, মনে হল জ্ঞান হারাবে। জঙ্গলের প্রত্যেকটা আওয়াজ কানে আসছে তার। কাছ দিয়ে খসখস শব্দ, দূরে বুনো শেয়ালের ডাক। কী করে এত বড় রাতটা কাটাবে সে? চোখের বাঁধন এক হ্যাঁচকায় খুলে ছুট লাগাবে? নাঃ, মনে পড়ে গ্রামের বুড়ি ঠাকুমার কথা। আহা! বুড়ির ছেলে, এক্কেবারে জোয়ান ছিল দাদাটা—বাঘে টেনে নিয়ে গেছে। ঠাকুমা বড় কাঁদে। মনে পড়ে সোরেনদাদার কথা। পাহাড় থেকে পড়ে পা ভেঙে গিয়েছিল। কত্তো দূরে শহরের হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল। পা-টা কেটে বাদই দিয়ে দিয়েছে। এখন তো কিচ্ছু করতে পারে না। সে এদের কথা ভেবে এতদিন ধরে 'যোদ্ধা' হবে ঠিক করেছিল, আর এখন ভয়ে পালাবে? মনকে বোঝায়—আমার বাবাও তো একদিন এভাবেই পরীক্ষা দিয়েছিল, পরীক্ষা দিয়েছিল দলের অন্য সদস্যরাও। তাহলে আমি কেন ভয় পাব? বুকের ভেতর থেকে যেন খুঁড়ে বেরিয়ে আসে ক্ষীণ ধারায় একটা স্রোত—সাহসের স্রোত। তারপর স্রোতটা বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে একসময় তার শিরদাঁড়াটা সোজা হয়ে যায়। সে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিল, এবারে মুখ তোলে। একটা রোখ চাপে তার। এর শেষ দেখতে হবে।

রংপা স্পষ্ট টের পায় গায়ের ওপর দিয়ে বেয়ে যাচ্ছে কোনও সরীসৃপ। এত ঠান্ডা! সাপই হবে। বেশ জোলো হাওয়া দিচ্ছে। হঠাৎ বৃষ্টি নামে। ভিজে যাচ্ছে সে—কনকনে ঠান্ডাটা আরও তীক্ষ্ণ হয়ে কাঁপুনি ধরায় শরীরে। জামাকাপড় ভিজে গেছে। রংপা চুপ করে বসে থাকে—তাকে জয়ী হতেই হবে। বুকের ভেতরটা যেইমাত্র সাহসে ভরে উঠল, তখন থেকে আর জঙ্গলের বিভীষিকাময় শব্দগুলি খুব একটা কানে এল না। ধীরে ধীরে ঘুম জড়িয়ে আসে চোখে। কিন্তু তবু ঘুমকে প্রশ্রয় দেয় না রংপা। জেগে থাকতে হবে তাকে, কঠোর সতর্কতায় জেগে থাকতে হবে।

অতন্দ্র রাত্রি প্রভাত হয়। নরম রোদের আলো ছুঁয়ে যায় গাল। রংপা চোখের বাঁধন খোলে। আঃ, বেঁচে আছে সে। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরলেই কেবল বোঝা যায় কত দামি এই জীবন, কত দামি প্রতিটা মানুষের জীবন। এবারে রংপা চারপাশে তাকাল, আর তখনই চমকে উঠে দেখল পেছনের পাথরে ঠিক তার মাথার ওপরে বসে আছেন বাবা!

''বাবা! তুমি কখন এলে?''

''আমি তো কোথাও যাইনি। এখানেই বসেছিলাম সারারাত। দেখছিলাম ভয়কে জয় করে কীভাবে তুমি একটু একটু করে একজন বীরযোদ্ধা হয়ে উঠছ। আর তোমায় দেখে দেখে গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠছিল।''

''আমার যে শুধু মনে হচ্ছিল আমি এত একা, যদি কিছু হয়ে যায় কে আমায় বাঁচাতে আসবে?''

বাবা স্মিত হেসে উত্তর দিলেন, ''আমি যে তোমার বাবা! তুমি কী করে ভাবলে, আমি তোমায় একা ছেড়ে দেব? তবে এই গোপন রহস্যের কথা প্রত্যেক পরীক্ষার্থী জানতে পারে পরীক্ষার শেষে। তারপর তাকেও এই রহস্যটি গোপনই রাখতে হয় সারাজীবন।''

রংপা বাবাকে জড়িয়ে ধরল। সাহসী রংপা, বিজয়ী রংপা, পরোপকারে দৃঢ়সংকল্প রংপা বাবার হাত ধরে ফিরে চলল গ্রামের পথে।

আমাদের পরীক্ষায় ফেলেন ভগবান—দুস্তর সেসব পরীক্ষা। কিন্তু সদুপায়পর সন্তানকে অতন্দ্র প্রহরায় রক্ষাও করেন। যে-বীর সন্তানটির মনোবল অটুট থাকে, ভাগ্যের চরম আঘাতে যে বলতে পারে, ''তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী'' —সেই পাশ-করা পুত্র বা কন্যাটিকে দেখে তিনি খুব খুশি হন। ''ঘুড়ি লক্ষে দুটো একটা কাটে/ হেসে দাও মা হাত চাপড়ি।'' গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, ''কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি''—হে কৌন্তেয়, নিশ্চিত জেনো, আমার ভক্তের বিনাশ নেই।'' যদি আমাদের ভরসাটুকু অটুট থাকে, যদি জানি যে আমাদের জীবন এক অলক্ষ্য সুরক্ষাবলয়ে সুরক্ষিত—তাহলে ভয় কী?

নবীকরণের বিজ্ঞপ্তি

পত্রিকার ফ্ল্যাপের ডানদিকে 31.3.23 প্রিন্ট করা থাকলে বুঝতে হবে পত্রিকাপ্রাপ্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে, নবীকরণ করতে হবে। এই বছর থেকে চাঁদার হার এবং রেজিস্ট্রি ব্যয় সামান্য পরিবর্তিত হয়েছে।

এক বছরের সডাক চাঁদা—180/-, তিন বছরের সডাক চাঁদা—500/-, পূজাসংখ্যা রেজিস্ট্রি ডাকে নেওয়ার জন্য (180+50) 230/- টাকা একবছরের জন্য পাঠাতে হবে।

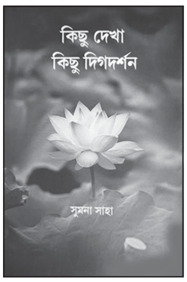
প্রতিটি সংখ্যা পৃথকভাবে নিতে হলে এক বছরের জন্য (180+140) 320/- টাকা পাঠাতে হবে। আর তিন বছরের জন্য (500+420) 920/- টাকা পাঠাতে হবে। এইভাবে নিলে পূজাসংখ্যার জন্য আলাদা রেজিস্ট্রি চার্জ দিতে হবে না।

গ্রন্থসমালোচনা

সুমনা সাহা, *কিছু দেখা কিছু দিগদর্শন*। লালমাটি প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০২২। ৪০০ টাকা।

এই সময়ের এক বলিষ্ঠ লেখিকা শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সুমনা সাহা। তিনি সম্প্রতি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলি দিয়ে একটি সুন্দর মালা গেঁথেছেন। মালাটির নাম দিয়েছেন 'কিছু দেখা কিছু দিগদর্শন'। 'নিবোধত', 'রবিবাসরীয় আনন্দবাজার পত্রিকা', 'ওপার বাংলা'—আমেরিকার আটলান্টা থেকে প্রকাশিত, 'বিশ্ববাণী', 'শব্দের মিছিল', 'বম্বে ডাক' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায় প্রকাশিত কুড়িটি প্রবন্ধের সংকলন এই বই। প্রতিটি প্রবন্ধ তথ্যসমৃদ্ধ এবং সুখপাঠ্য।

দুই মনীষী স্বামী বিবেকানন্দ এবং মহাত্মা গান্ধী সমসাময়িক। তাঁদের দেখা হয়েছিল কী না, পরস্পর পরস্পরকে কী চোখে দেখতেন—এসব জানা যাবে 'যুগনায়ক সকাশে জাতির জনক : শুভ সমন্বয়ের শতবর্ষ' প্রবন্ধটি থেকে। ছাতা নিয়ে দেশবিদেশে কত গল্প, লোকগাথা। বিভিন্ন দেশে এর ব্যবহারের ইতিকথা জানতে হলে পড়তে হবে 'ছায়ার মায়া : মাথা রক্ষার বিশ্বস্ত সঙ্গী' প্রবন্ধটি। সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন এবং ভারতভগিনী নিবেদিতার, অথবা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও লোকমাতা নিবেদিতার মধুর সম্পর্ক নিয়ে রয়েছে দুটি অনবদ্য লেখা। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, রাজা রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের এক নিবেদিতপ্রাণ সেবক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের জীবনকাহিনির বিস্তৃত আলোচনায় ঋদ্ধ এই পুস্তক। করুণাবতার গৌতম বুদ্ধের দার্শনিক চিন্তার অনন্যতা লিপিবদ্ধ এই পুস্তকের অনেকগুলি পৃষ্ঠা জুড়ে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লেখিকার কাল্পনিক কথাবার্তায় রয়েছে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল থেকে একটি কলা আছে যার নাম 'অবধানম্'। বিলুপ্তপ্রায় এই কলাটির অনুশীলনে মনে রাখার শক্তি অনেকগুণ বেড়ে যায়। এমনই অনেক প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের রসাস্বাদন করা যাবে বইটি পড়লে।



লেখিকা প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। সাহায্যকারী বইগুলির নাম কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করেছেন বলে সঠিক তথ্যও জানা যায়। সাধারণ পাঠককে বইটি জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়াতে, সুন্দর অবসর যাপন করতে এবং একাকিত্ব দূর করতে সাহায্য করবে। প্রতিটি প্রবন্ধ পাঠের আকর্ষণ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবনয়নের এই কঠিন মুহূর্তে পুস্তকটি এক অমূল্য সম্পদ। পাঠক নিশ্চয়ই এর কদর করবেন। ✠

গৌতম পতি

সঙ্ঘসংবাদ

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন দিরাং কেন্দ্রে অতিথি ভবনের উদ্বোধন

গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ অরুণাচল প্রদেশের দিরাং কেন্দ্রে নবনির্মিত অতিথি ভবনের উদ্বোধন করেন শ্রীফুরপা শেরিং (দিরাং-এর বিধায়ক এবং অরুণাচল প্রদেশের গৃহমন্ত্রীর উপদেষ্টা)। উপস্থিত ছিলেন প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণামাতাজী (শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সহ সম্পাদিকা), প্রব্রাজিকা অনিলপ্রাণামাতাজী (দিরাং কেন্দ্রের সম্পাদিকা) ও গণ্যমান্য অতিথিবৃন্দ। স্কুলের ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সকলকে আনন্দিত করে। মাননীয় বিধায়ক ও অতিথিরা সকলে মধ্যাহ্নে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ভগিনী নিবেদিতার বাসভবন সংলগ্ন অংশে শিক্ষা ও সেবাকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ৪ মার্চ ২০২৩ বাগবাজারে ভগিনী নিবেদিতার বাসভবন সংলগ্ন ১৯ নম্বর মা সারদামণি সরণিতে (পূর্বতন বোসপাড়া লেন) একটি শিক্ষা ও সেবাকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন পূজনীয়া প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণামাতাজী (সাধারণ সম্পাদিকা, শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশন)। এই উপলক্ষ্যে সেখানে পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ হয়। শ্রীসারদা মঠের মূল কেন্দ্র ও অন্যান্য শাখাকেন্দ্র থেকে সন্ন্যাসিনী ও ভক্ত সহ প্রায় দুশো জন উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রী মাননীয়া শশী পাঁজা সহ বহু গণ্যমাণ্য ব্যক্তি। সকলকেই মধ্যাহ্নে প্রসাদ দেওয়া হয়।



তাঁর বাসগৃহটিকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে বিশ্ববিদ্যালয়—এ ছিল ভগিনীর স্বপ্ন। আপাতত ওই শিক্ষাকেন্দ্রে মূল্যবোধ ও জীবনের উৎকর্ষের পাঠ দেওয়া হবে। পাশাপাশি থাকবে প্রবীণদের দেহমনের পরিচর্যা সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ (জেরিয়াট্রিক) বিভাগ।

রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিরিটি কেন্দ্রের রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন

গত ১১ মার্চ ২০২৩ শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের পুণ্য জন্মতিথিতে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, সিরিটি কেন্দ্র রজতজয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করল। এই উপলক্ষ্যে নবনির্মিত প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন পূজনীয়া

প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণামাতাজী। সকাল সাতটায় সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীদের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে ভাবগম্ভীর পরিবেশে পুরনো মন্দির থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি নতুন গর্ভগৃহে নিয়ে যাওয়া হয়; সেখানে নতুন প্রতিকৃতির সঙ্গে তাঁরা আসীন হন। অমলপ্রাণামাতাজী দিব্যত্রয়ীকে অর্ঘ্যদান ও আরতি করেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী মহারাজের ষোড়শোপচার পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ হয়। প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মঞ্চে পূজনীয়া অমলপ্রাণামাতাজী রজতজয়ন্তী স্মারক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং সৎপ্রসঙ্গ করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ করেন প্রব্রাজিকা গৌতমপ্রাণা। প্রথিতযশা শিল্পী জয়তী চক্রবর্তী, সুদেষ্ণা সেনগুপ্ত, প্রজ্ঞা গাঙ্গুলি ও সংযুক্তা দাস ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। শ্রীসারদা মঠের মূল কেন্দ্র ও অন্যান্য শাখাকেন্দ্র থেকে সমবেত হয়েছিলেন একশো তেরো জন সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণী। প্রায় দু-হাজার ভক্ত দুপুরে অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করেন। সারাদিন ধরে আরও প্রায় তিন হাজার ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। কাছাকাছি বস্তি অঞ্চল ও একটি অনাথাশ্রমে প্রসাদ পাঠানো হয়। বিকেলে শ্রীরামনামসংকীর্তন, সান্ধ্য আরতি ও ভজনের পর নাটমন্দিরে সন্ন্যাসিনী-ব্রহ্মচারিণীদের ভক্তিগীতি এবং স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের জীবনীপাঠের মধ্য দিয়ে সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।





রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সিরিটি কেন্দ্র গত ৮ এপ্রিল রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্কের বিবেকানন্দ হলে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করে। বিষয় ছিল : রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনে সর্বজনীনতা ও শ্রীশ্রীমা। সভানেত্রী প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণামাতাজী; বক্তারা : প্রব্রাজিকা আপ্তকামপ্রাণা, রাইকমল দাশগুপ্ত এবং দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত। দ্বিতীয়ার্ধে সংগীত পরিবেশন করেন প্রসিদ্ধ গায়িকা নূপুরছন্দা ঘোষ।

সিস্টার নিবেদিতা স্কুলের উচ্চমাধ্যমিক বিভাগের উদ্বোধন

গত ৩০ মার্চ ২০২৩ রামনবমী তিথিতে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলের উচ্চমাধ্যমিক ভবনের (৩ বি নিবেদিতা লেন) উদ্বোধন করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণামাতাজী। এই উপলক্ষ্যে পূজনীয়া মাতাজী প্রব্রাজিকা জপপ্রাণামাতাজী রচিত 'লহ অঞ্জলি লহ প্রণাম' নামক একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেন। সন্ন্যাসিনী, ব্রহ্মচারিণী, ছাত্রী-শিক্ষিকা ও ভক্ত সহ উপস্থিত ছিলেন প্রায় দুশো জন। সকলেই প্রসাদ গ্রহণ করেন।

নিবোধত গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্র

SRI SARADA MATH, SARAT PALLY, PASCHIM MEDINIPUR 721101, PH. NO. – 6289958929

RAMAKRISHNA SARADA MISSION Centres
RKSM SISTER NIVEDITA GIRLS' SCHOOL, 5, NIVEDITA LANE, BAGBAZAR, KOLKATA-700003.
PH. NO. 2554 1516

RKSM MATRI BHAVAN, 7A, SREE MOHAN LANE, KOLKATA – 700026. PH.NO. 2464 4937

RKSM ASHRAMA, P 22, C.I.T. ROAD, ENTALLY, KOLKATA -700014. PH. NO. 2264 3201

RKSM VIVEKANANDA VIDYABHAVAN, 33, NAYAPATTY ROAD,DUM DUM, KOLKATA – 700055.

RKSM SHIKSHA MANDIR, 134, BARUIPARA LANE, KOLKATA- 700035. PH. NO. 2577 1243

RKSM, 44/28, RAJA RAMMOHAN ROY ROAD, SIRITI, KOLKATA – 700082. PH. NO. 2402 4818

RKSM, 8/7/2 , KANTANAGAR ROAD, P.O. – KASSIMBAZAR RAJ, MURSHIDABAD – 742 102
PH. NO. – 8902675546

RKSM, P.O. RAMGOPALPUR, VILL. -SILLA, BURDWAN – 713404, PH.NO. (0342)2459255

RKSM, P.O. & VILL. THAKURNAGAR, MEDINIPUR – 721430. PH. NO. (03220)276311

RKSM, DIAMOND HARBOUR ROAD, GANGARAMPUR, 24 PGNS(S) – 743503, PH.NO. 24709537

RKSM, SARADA PALLI,
SAHEB KACHARI, BALURGHAT,
DAKSHIN DINAJPUR – 733101
PH. NO. 9007636946

BIRATI SREERAMKRISHNA
BHAKTA SANGHA
MATRIMANDIR BHAVAN(1ST FLOOR)
8, M.B. RD., BIRATI, KOLKATA-700051.
PH. NO. 858404140(P.BHOWMIK)

BARSHA MUKHERJEE
E.C. 190, SECTOR 1,SALT LAKE
KOLKATA – 700064, PH.NO. 9330932366
RAMAKRISHNA MATH, BARISHA
59, MOTILAL GUPTA ROAD
KOLKATA- 700008. PH. NO. 9051183374

SRI JAYANTA BISHNU BISWAS

RAMAKRISHNALAYA,
RABINDRANAGAR
(SOUTH), P.O. : NOAPARA, BARASAT,
KOLKATA – 700124
PH. NO. : 8777286006 /9432429160

SRI NIMANANDA NAYAK
DURGAPUR, BURDWAN,
PH. NO. 9337678816

SWAMI VIVEKANANDA VANI PRACHAR SAMITY
6 , VIDYASAGAR AVENUE, B- ZONE,
DURGAPUR, BURDWAN – 713 205
PH. NO. – 8436765762

SRI DEBASHIS CHAKRABORTY
DESHBANDHU RD. SUBHASPALLY
P.O. – BURNPUR, BURDWAN – 713 325
PH. NO. – 9434576636

SAMANTA HARDWARE
C/O SRI GOUTAM DAS
GHUTKIPARA, ASHRAM BHAVAN
KATWA, BURDWAN – 713 130
PH. NO. -9332241395
SRI RAMAKRISHNA MATH TAMLUK
MIDNAPUR – 721 736, PH. NO. - 9474423568

BARGACHIA SRI RAMAKRISHNA
VIVEKANANDA ASHRAMA
VILL. & P.O. BARGACHIA
HOWRAH – 711404.
PH. 9475688692/9434643409
(CONTACT PERSON: SRI DULAL MANNA)

CHINMOY BANDYOPADHYAY
FLAT NO. IF 3,PABANJYOTI APTS.
19/2, DAW TEMPLE RD.,RASBARI
BALLY, HOWRAH – 711201
PH. NO. 9339808137

P.S. RAJYALAKSHMI
FLAT C,GROUND FLOOR, 23/4, GHOSH'S LANE,
BELUR MATH, HOWRAH

SM. SANCHITA NANDY
66/3, KANTAPUKUR , 3RD BYE LANE
KADAMTALA, HOWRAH – 711 101
PH. NO. : 9433161692

SRI RAMAKRISHNA MANDIR
13/1, SRI RAMAKRISHNA MANDIR PATH
HOWRAH – 711 101
PH. NO. : (033) 2651 8707 / 9230171704

RAMAKRISHNA MISSION KASUNDIA
4, NASKARPARA LANE, KASUNDIA
HOWRAH, PH. NO. (033)2642 0932

SM. PARUL DAS, JOGENDRA KUNJA
NALIKUL BANI MANDIR SCHOOL RD.
VILL. & P.O. – NALIKUL, HOOGHLY – 712407
PH. NO. 9474805344

SM. CHINMAYEE NANDY
C/O SRI BRAJANATH NANDY

'SRI MADHAV' BEHIND STATE BANK
DANKUNI, HOOGHLY -712331
PH. NO. - 9874146971

SRI RK. BHAV SAMANWAY CHAKRA
VILL. – MEHERPUR, P.O. – KANUIBANKA
HOOGHLY – 712 301
CONTACT PERSON : BASUDEB KOLEY
PH. NO. : 8972214140 / 6297859294

SRI KRISHNA DEBNATH
JASHRA, CHAKDAHA, NADIA- 741222
PH. NO. – 9434419186

RAMAKRISHNA ASHRAM
ASHRAM ROAD, KRISHNANAGAR,
NADIA – 741101
PH. NO. -9002317088 / 8900026197

SRI RAMAKRISHNA SEVASHRAM
P.O. – AKALIPUR, DIST. – BIRBHUM
PH. NO. – 9434557238 / 9475155362

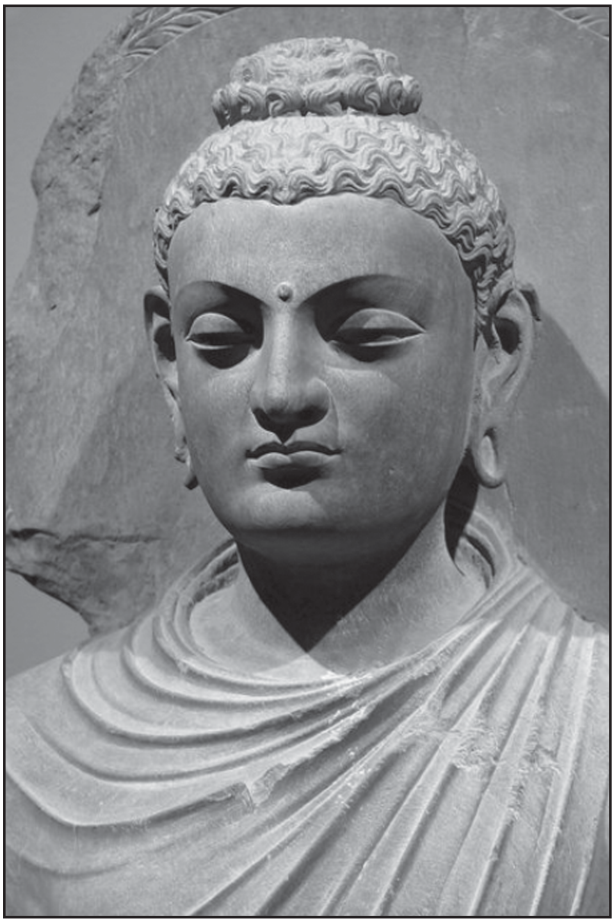
RAMAKRISHNA MISSION SEVASHRAM
RAMAKRISHNA MISSION ROAD
SILCHAR, ASSAM – 788004
PH. NO. (03842) 266 789 / 267 789

RAMAKRISHNA MISSION ASHRAMA
MALDA – 732 101
PH. NO. – (03512) 252479 / 8777709328

SRI RAMAKRISHNA SEVASHRAMA
C/O SM. MANU ROY
SCHOOLPARA, P.O. – KALIYAGANJ
UTTAR DINAJPUR – 733 129
PH. NO. – 9641960462

RAMAKRISHNA SEVASHRAMA
BANKURA - 722 101, PH. NO. – 0339094534

SM. PARSATI DAS, C/O SRI SAROJ DAS
KATWA SRI RK. SEVASHRAM
VIVEKANANDA SARANI, GHOSHHAT, KATWA
BURDWAN (E) -713 130
PH. NO. – 8900139288 / 7001045451



যে স্বার্থপরতা ত্যাগ করতে পেরেছে, শান্তি এবং সত্যকে লাভ করেছে, সেই সুখী। সত্য মহান ও মধুর। সত্যই একমাত্র দুঃখদুর্দশা থেকে তোমাকে মুক্ত করতে পারে। সত্য ব্যতীত জগতে উদ্ধারকর্তা আর কে আছে?

—ভগবান বুদ্ধ

শিপ্রা দেব



তোমার দুঃখের কারণ যাই হোক না কেন, অপরকে আঘাত কোরো না। অপরের প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশই ধর্ম। সব প্রাণীর প্রতি অন্তরের অসীম মৈত্রী পোষণ করো।

—ভগবান বুদ্ধ

মায়া দাস

ঈশ্বরকে উপাসনা করার মনোভাব নিয়ে ঈশ্বরকেই দরিদ্র, দুঃখী ও দুর্বলের মধ্যে সেবা করো। তা করতে পারলে ফলপ্রাপ্তি গৌণ কথা। লাভের বাসনা না রেখে ঐ ধরনের কর্ম করলে আত্মার মঙ্গল হয় এবং এমন ব্যক্তিদেরই স্বর্গরাজ্য লাভ হয়। এই স্বর্গরাজ্য রয়েছে আমাদেরই মধ্যে। সকল আত্মার আত্মা যিনি, তিনি সেখানেই বিরাজ করেন। তাঁকে অন্তরে উপলব্ধি করো। এটিই কার্যে পরিণত ধর্ম, এটিই মুক্তি।

—স্বামী বিবেকানন্দ

আবেদন

বহু বছর যাবৎ নিবোধত পত্রিকার গ্রাহক চাঁদা অপরিবর্তিত রয়েছে। বর্তমানে অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য আমরা বর্তমান পত্রিকাবর্ষ থেকে (মে ২০২৩) গ্রাহক চাঁদা সামান্য বাড়াতে বাধ্য হলাম। এতৎসত্ত্বেও পত্রিকা চালানোর ব্যয় বহন করা কঠিন হয়ে উঠছে। তাই শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচারের এই শুভ প্রচেষ্টায় আপনারা সহায়তা করুন। সহৃদয় পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, ভক্তবৃন্দ, বিভিন্ন সংস্থা, পৃষ্ঠপোষক—সকলের কাছেই আমরা সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

বর্তমান মে-জুন ২০২৩ সংখ্যা থেকে পত্রিকার ই-সংস্করণ পাওয়া যাবে। পেতে চাইলে ইমেলে যোগাযোগ করুন।

আপনার অনুদান চেক বা ড্রাফট-এ ‘Sri Sarada Math’ এই নামে পাঠাবেন।
সঙ্গে একটি চিঠিতে উল্লেখ করুন : আপনার দানের অঙ্ক, নাম, ঠিকানা, প্যান ও মোবাইল নম্বর।
চিঠির উপর উল্লেখ করুন : ‘নিবোধত-র জন্য অনুদান’।
যে-কোনও দান ৮০ জি ধারায় আয়করমুক্ত।

যোগাযোগ : ৬২৯০৬৪৯৫২৯, ৯৯০৩৪৯১৯২৯
নিবোধত কার্যালয়, শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭০০০৭৬
অনলাইন ট্রান্সফার-এর জন্য :
nibodhatapatrika@gmail.com, nibodhata.despatch@gmail.com

নমস্কারান্তে—
প্রব্রাজিকা আপ্তকামপ্রাণা

Nivodhata Patrika: 9903491929
Email: nibodhatapatrika@gmail.com

Vol. 37, No. 1, May-June 2023
Publishing Date: 1 May 2023

ISSN 0972-4877
R.N.I. 44112/87



Printed and published by Pravrajika Aptakamaprana on behalf of the Board of Trustees of Sri Sarada Math, Dakshineswar, Kolkata-76. Printed at Swapna Printing Works Pvt. Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, 24 Parganas (N), Kolkata 700132. Published from Sri Sarada Math, Dakshineswar, Kolkata-76.
PRICE: Rs. 25